এই বইতে আছে

এক টাকা আট আনা

মার্চ্চ ১৯৪৭

এই বই প্রকাশ করেছেন সরস্বতী লাইব্রেরীর তরফ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, সি ১৮।১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ছেপেছেন শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ

সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক

সংঘর্ষ ঘটেছে ও ঘটছে তা'তে নিহত

হিন্দু-মুসলমান দেশবাসীর

স্মরণে—

পরিচায়িকা

হিন্দু ও মুসলমান বড়লোকের দল ষড়যন্ত্র ক'রে ইংরেজকে ভারতের রাজতক্তে বসায়। হিন্দু সেনাপতি চেষ্টা ক'রেও মুসলমান নবাবের আসন রক্ষা করতে পারেনি। হিন্দু মুসলমানের এই রাজনৈতিক মিলন এই দু'শো বছরে হয়তো সাংস্কৃতিক মিলনে, সংমিশ্রণে দানা বেঁধে উঠ্‌তো। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসন এই দু'য়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। তার কল্পনা ছিল, এদেশে চিরন্তন হয়ে থাকবে। রাজ-নীতির ব্যবসায়ে সে সুনিপুণ। জাতির অন্তর্নিহিত বিভেদে তার প্রয়োজন। চিরন্তন হয়ে থাকতে গেলে ভারতীয় জাতির মিলন ও ঐক্য তার পক্ষে অন্তরায়। হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষে এই দুই ধর্মের অস্তিত্ব তার কাজে লাগলো।

ইতিহাসে চিরদিন দেখা গেছে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে —যে, কোনো দুই জাতি বা ধর্মের লোক পরস্পর সম্মুখীন হ'লে প্রথমত তাদের সংঘর্ষ হয়েছে, পরে দুইয়ে মিলে এক বিচিত্র সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে। এমনি করে শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এমনি করেই মানুষের সভ্যতা ইতিহাসের ধারার ভিতর দিয়ে এক বিরাট সভ্যতা হয়ে, সর্ব মানবের সম্পদ হয়ে গ'ড়ে ওঠার দিকে চলেছে। অথচ আজ রব উঠেছে, ভারতবর্ষ এক জাতির দেশ নয়। হিন্দু ও মুসলমান এমন দুই পৃথক জাতি যে, এদের সংমিশ্রণে একটা নেশন্‌ হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানে দুই নেশনের দুই পৃথক রাষ্ট্র হবে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান।

এই অবিমিশ্র জাতির রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা আমরা সম্প্রতি দেখেছি

জার্মানীতে হিট্‌লারের ভিতর। সেখানেও আমরা এই প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনার যে-রূপ দেখেছি, আজ ভারতবর্ষেও তারই প্রতিচ্ছবি দেখ্‌ছি। দুই দেশেই অবিমিশ্র জাতির রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার যে উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে, তাও সম্পূর্ণ এক রাষ্ট্রশক্তির সহায়ে বলপ্রয়োগ এবং রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধপ্রবণতার সৃজন ও প্রসার। এর ফল দাঁড়িয়েছে, হিন্দু আজ মুসলমানকে দেখলে ভাবে শত্রু, মুসলমান হিন্দুকে দেখলে ভাবে শত্রু। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত এরা পাশাপাশি বাস করেছে, পরস্পরে সর্বব্যাপারে আত্মীয়বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেছে, এমন কি সঙ্গীতে সাহিত্যে, আর্টে বিজ্ঞানে, সভ্যতার উপাদান গঠনে পরস্পর সহযোগিতা ক'রে আনন্দ পেয়েছে, গৌরব বোধ করেছে।

ভারতবর্ষে দুই অবিমিশ্র জাতির রাষ্ট্র হবে, এই পরিকল্পনার পুরোহিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন আজ মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে মিঃ জিন্না পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর তীব্র বিরোধিতা করেন। ধর্মের ভিত্তিতে যদি নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত না হ'ত, তাহ'লে হিন্দু ও মুসলমান দুই পৃথক জাতি একথা উঠবারই কোনো অবকাশ কোনো কালে হ'ত না। ভোটের জোরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাত করবার পথে ধর্মের দোহাই এত কার্যকরী ব'লেই না আজ ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গড়বার পরিকল্পনা এসেছে। আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসক এখানে তার স্বার্থরক্ষার পথে অনেক বেশী দূরদৃষ্টি দেখিয়েছে। দীর্ঘকালের অসাড়তার পর ভারতবর্ষে যখন রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিল, সাম্রাজ্যবাদী তখনই ভয় পেয়েছে, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে একদিন ভারতীয় জনগণের ঐক্য গ'ড়ে উঠবে এবং তখনই বিপ্লবের সাফল্য অনিবার্য হয়ে উঠবে। তখন থেকে সে এক প্রতি-বিপ্লবী শক্তির গোড়াপত্তন করে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা ক'রে।

সেই বিষ-বৃক্ষে ফল ধ'রে আজ পেকে উঠেছে। বিপ্লবী শক্তি আজ যখন সফলতার মুখে, প্রতি-বিপ্লবী শক্তিও তখন তুমুল হয়ে উঠেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রতি-বিপ্লবী শক্তি যা সে সৃষ্টি করতে পেরেছে, তার ভিত্তির ব্যাপকতা ও দৃঢ়তা হয়তো তার নিজেরই কল্পনার বাইরে ছিল। একটা গোটা ধর্মের লোককে প্রায় সে এর সঙ্গে জড়িত করতে সক্ষম হয়েছে। আজ সারা ভারতবর্ষে বিপ্লবী আর প্রতি-বিপ্লবী শক্তিতে হানাহানি শুরু হয়েছে। কত রক্তপাত হচ্ছে, কত গ্রাম নগর ধ্বংস হচ্ছে, কত মানুষ দলে দলে নির্যাতন, লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে নিঃস্ব হয়ে পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। মানুষ যেন তার মনুষ্যত্বের সম্মান, মানব-অস্তিত্বের গৌরববোধ হারিয়েছে। মানুষের যুগ যুগান্তের কৃষ্টি-সাধনা যেন আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে চলেছে।

কিন্তু ইতিহাসের দিকে যাঁদের দৃষ্টি আছে, ভয় পাবার তাঁদের কিছু নেই, নিরাশ হবার কিছু নেই। প্রতি-বিপ্লবী শক্তি চিরদিনের ইতিহাসেই বিপ্লবকে এমনি ক'রে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। বহু দেশেই এমনি ক'রে বিপ্লব আর প্রতি-বিপ্লবের দ্বন্দ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণত্যাগ করেছে, কত ঘরবাড়ী, গ্রাম নগর, প্রদেশ ধ্বংস হয়েছে, কত মানুষ গৃহচ্যুত হয়েছে। জনগণকে এ এক সাময়িক পাগলামীতে পেয়ে বসে, যে পাগলামীর সৃষ্টি করে প্রতি দেশে প্রতি-বিপ্লবী শক্তির নেতৃস্থানীয়রা। এই নেতৃস্থানীয়রা সব সময়েই উদ্বুদ্ধ হয় উচ্চতর শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হবার বা প্রতিষ্ঠিত থাকবার আকাঙ্ক্ষায়। জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এই নেতৃস্থানীয়েরা জনগণকে তার নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যায় মিথ্যার আশ্রয়ে। আজও এক প্রচণ্ড মিথ্যার আশ্রয় এই নেতৃ-স্থানীয়দের মিলেছে অবিমিশ্র "জাতির" রাষ্ট্রের পরিকল্পনার ভিতর।

এই পাগলামী, এই প্রতি-বিপ্লব তখন বিপ্লবকে পর্যুদস্ত করবার উপক্রম করেছে, জনগণকে যখন বিভ্রান্তির চরমে টেনে এনেছে, তখনই আমাদের বিপ্লবের প্রতীক, সমগ্র বিপ্লবী-ভারতের শ্রেষ্ঠতম গণনেতা, বর্তমান জগতের সাধারণ মানবের বিপ্লবী আদর্শ যাঁর ভিতর মূর্ত হয়ে উঠেছে, সেই মহাত্মা গান্ধী জনগণের অজ্ঞতা দূর করতে, প্রতি-বিপ্লবের মূলে কুঠার হানতে পরিব্রাজকের বেশে ঘুরছেন নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে, বিহারের জনপদে জনপদে। মানব তার মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে সাধারণ মানবের বিপ্লবকে সার্থক ক'রে, এই তাঁর আদর্শ। উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থোন্মাদ প্রতি-বিপ্লবীর দল, অজ্ঞতার অন্ধকারেই ভাল চলে যাদের উপজীবিকা আর বৃত্তি, তারা আলোর আভাসে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ধর্মের দোহাই পেড়ে, অজানিত ভাষায় প্রকাশিত ধর্মের মিথ্যা ব্যাখ্যার ধ্বনিতে জনগণকে শেখাচ্ছে আলোকে ভয় পেতে, চিরদিন মিথ্যার ইঙ্গিতে চালিত হ'তে, মানুষ হয়ে অমানুষের আচরণ করতে এবং এই আচরণে বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে।

বিপ্লবের, সত্যের আর মিথ্যার, আলোক আর অন্ধকারের এই দ্বন্দ্ব আজ ভারতবাসীর জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। কিন্তু এ সাময়িক। মিথ্যার এই অভিযান যদি সফল হ'ত, মানুষের আশা করবার কিছু থাকতো না। আমাদের বরং বিশ্বাস, আজকের এই আঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে হিন্দু আর মুসলমানের পরিপুর্ণতর মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে চলেছে। আর সেই মিলন-সাধনায় যজ্ঞ করছেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর অশীতিবর্ষ বয়সে। প্রত্যেক বিপ্লবী ভারতীয়ের কর্তব্য, যার যার নিজ শক্তি অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধীর এই সাধনাকে সফল করার কাজে, এই যজ্ঞকে ফলপ্রসূ করার কাজে সহায় হওয়া।

এই দিনে আমার অতি প্রিয় অধ্যাপক শ্রীমান দিলীপকুমার

বিশ্বাসের "ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা" নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। দিলীপ কুমার খেটেছেন, পড়েছেন, এবং যা পড়েছেন তা আত্মস্থ ক'রে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। বইখানির প্রতি ছত্রে সেই পরিশ্রম, সেই পাঠ এবং সেই চিন্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বহু গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত উপদান নিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, কল্পনীয় হিসাবে অবিমিশ্র নেশনের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং অস্তিত্ব অসম্ভব। দিলীপকুমারের বইখানি কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রচিত হয়নি। যদিও বইয়ের নামের সঙ্গে কথাটা রয়েছে 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা', তিনি প্রকৃতপক্ষে এ বইয়ে যা প্রমাণ করেছেন তার মর্মকথা এই যে মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতা কোনো বিশেষ "বিশুদ্ধ-রক্ত" জাতির সৃষ্টি নয়।

আজ যাঁরা ভারতবর্ষে অবিমিশ্র নেশনের কথা তুলেছেন, তাঁদের চোখ পড়ে রয়েছে আরব দেশের প্রতি। শ্রীমান দিলীপ কুমার প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখিয়েছেন যে, আরবের কৃষ্টি-সভ্যতা এবং শিক্ষাও কোনো "বিশুদ্ধ-রক্ত" জাতির সৃষ্টি নয়। আজ অবিমিশ্র নেশনের জন্য যাঁরা ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র চাইছেন, তাঁরাও যে পবিত্র কোর-আনের কত ভুল ব্যাখ্যা ক'রে আমাদের জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন তা শ্রীমান দিলীপের বইয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

'ইসলামের উদার বিশ্বদৃষ্টি আরবের রাজনৈতিক জগতে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, তার একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে স্বয়ং হজরৎ মহম্মদের জীবিত কালের একটি আচরণ থেকে। প্রতিপক্ষদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রামের সময়ে হজরত মহম্মদ যখন মদিনায় এসে উপস্থিত হলেন, সেই সময় তাঁকে একটি কঠিন সমস্যার

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মদিনায় তখন নানা পরস্পর-বিরোধী ধর্মসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল; এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কিভাবে এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এই ছিল মহম্মদের সমস্যা। কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি এই রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা এখানে বর্ণনা করছি—বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের ভাষায়—তাঁর রচিত হজরৎ মহম্মদের সুপ্রসিদ্ধ জীবনচরিত থেকে —"পরস্পর বিপরীত চিন্তা-রুচি ধর্মভাবসম্পন্ন ইহুদী, পৌত্তলিক, মুছলমানদিগকে দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলবিধানের জন্য একই কর্মকেন্দ্রে সমবেত হইতে হইবে। **তাহাদিগকে একটি রাজনৈতিক জাতি বা 'কওমে' পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে একদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়সমূহ ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াও দেশমাতৃকার সেবা-মন্দিরে একত্র সমবেত হইতে পারে এবং হওয়াই কর্তব্য।**"[1] মহাত্মা গান্ধীও আজ গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঘুরে যে-বাণী প্রচার করছেন, হজরত মহম্মদের বাণী থেকে তা যে কত অভিন্ন, হিন্দু মুসলমান প্রত্যেক পাঠকেরই তা সহজে চোখে পড়বে।

এইরূপ আরও কত কথাই শ্রীমান দিলীপের বই থেকে উদ্ধৃত করতে লোভ হয়। কিন্তু স্থানাভাব, এবং তার প্রয়োজনও নেই। বইখানি আয়তনে বড় নয়। ভাষাও প্রাঞ্জল। যে-কোনো পাঠক অনায়াসে বইখানি পড়তে পারবেন। একালের পক্ষে একটু অসাধারণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে পড়াশুনো ক'রে দিলীপ যে মালমশলা সংগ্রহ করেছেন, তাতে তিনি এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, বইয়ের আয়তন

সর্বসাধারণের পাঠ-ক্ষমতার আয়ত্তে রেখে বর্তমানে তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে আজ সর্বসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে বলীয়ান ক'রে তুলবার অশ্রান্ত প্রয়াস চলেছে, সেখানে সাধারণের হাতে এই বইখানি বিপ্লবের বিশেষ সহায়ক হবে।

কিন্তু পুর্বেই বলেছি, শ্রীমান দিলীপের উদ্দেশ্য ব্যাপকতর, তাঁর দৃষ্টি সুদূরের দিকে। তিনি দেখাতে চান, যে কৃষ্টি ও সভ্যতা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তাদের প্রবণতা গণ্ডী বাঁধার দিকে নয়, গণ্ডী ভাঙার দিকে। মানবের সভ্যতা, কৃষ্টি গড়ে উঠেছে ও যুগের পর যুগ ধ'রে প্রসারিত হ'তে হ'তে চলেছে পরস্পরের সঙ্গে উদার সংমিশ্রণে। জাতিতে জাতিতে মিলে যেমন নেশন সৃষ্টি হচ্ছে, নেশনে নেশনে মিলে তেমনি বিশ্ব-সভ্যতা ও বিশ্ব-কৃষ্টি গড়ে তুলছে। সমাজের বর্তমান ভিত্তির অস্বাভাবিকতা ঘুচাবার জন্যে আজ যে বিশ্বব্যাপী সাধারণ-মানবের বিপ্লব চলেছে, এই বিপ্লব যেদিন সফল হবে, সর্বজাতির সভ্যতা ও কৃষ্টিতে মিলে মানব সভ্যতার ও কৃষ্টির এক বিরাট ধারা সেদিন রচিত হবে এবং তা হবে সর্বমানবের নিত্য-ব্যবহার্য সম্পদ! সেই বিরাট ধারায় অবগাহন ক'রে মানুষ তার আজকের অমানুষিকতার ক্লেদ থেকে মুক্ত হবে। ভারতীয় সমাজের বর্তমান বিচ্ছিন্নতার ভিতর একথা ভাবতে ও বলতে বলিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। শ্রীমান দিলীপ সেই বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। একথা জোর ক'রে বলা যায়, এই বলিষ্ঠ সাধনায় ব্যর্থতার কোনো স্থান নেই।

কংগ্রেস ক্যাম্প
বিজয়নগর, নোয়াখালি
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫৩

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

মুখবন্ধ

সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র হালে অনেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন—এবং এই বিষয়ে কয়েকখানি সুচিন্তিত গ্রন্থও প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রদ্ধেয় দেশনেতা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের India Divided এবং এর কিছু পুর্ব্বে লেখা অশোক মেহ্‌তা এবং অচ্যুত পট্টবর্দ্ধনের দ্বৈত রচনা The Communal Triangle in India নামক বই দু'খানি এই প্রসঙ্গে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলে যে সমস্যাটি আজকের দিনে সুপরিচিত, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেটি আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ আধুনিক যুগের একটি নিছক রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে এটিকে বিচার করা যায়। এই কায উপরে উল্লিখিত পুস্তকদ্বয়ের রচয়িতারা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সম্পন্ন করেছেন। পরবর্ত্তী লেখকদের জন্য তাঁরা বড় বেশী কিছু বাকী রেখেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু সমস্যাটির আর একটি দিক আছে—যার আলোচনা এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত ভাবে হ'য়নি। আজকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাণ্ডারা মূল প্রশ্নটিকে আর নিছক রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে রাজি নন। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির সমর্থনে তাঁরা এক নব্য দর্শন গড়তে ব্যস্ত, এবং এর জন্য আমাদের এই হতভাগ্য দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে নিয়ে টানাটানির আর অন্ত নেই। ভারতবর্ষে সম্প্রদায় বিশেষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে এই নব্য সাম্প্রদায়িক দর্শন যে উগ্র এবং অসংযত রূপ ধরে দেখা দিয়েছে, তার সাধারণ নাম "দুই জাতি-বাদ" বা সুপরিচিত ইংরাজী প্রতিশব্দানুযায়ী "Two-Nation-Theory". এই নূতন দর্শনের মর্ম্ম কথা হ'চ্ছে—যে দুটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোক নিয়ে ভারতের জন সংখ্যা

প্রধানতঃ গঠিত—সেই হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি এবং এদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতাও পরস্পারের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই নব্য দর্শনের মধ্যেই আজকালকার সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা খুঁজছেন বহুল-প্রচারিত পাকিস্তান বা রাষ্ট্রনৈতিক মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি। এই দর্শনের সত্যাসত্য যাই হোক না কেন পাকিস্তানপন্থীদের কাছে এটা বড়ই মুখরোচক সন্দেহ নেই। সুতরাং পাকিস্তান আদর্শের পরিপ্রেক্ষি হিসাবে এই "দুই-জাতি-বাদ" রূপ দর্শনের প্রচারে এঁরা সর্ব্বদা মুখর। উক্ত সাম্প্রদায়িক দর্শনের ভিত্তিটাকে যাচাই করে দেখবার প্রয়াস থেকেই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থটির জন্ম। "India Divided" বা "The Communal Triangle in India" পুস্তকগুলির লেখকবৃন্দের তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর নানা ভাবে আলোকপাত করলেও, এই দিকটি সম্পর্কে তাঁরা ততটা মনোযোগ দেননি। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবেই মূলতঃ তাঁরা প্রশ্নটির বিচার করেছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং আলোচনা-প্রণালী খানিকটা আলাদা—ভারতীয় সংস্কৃতির যে মূল ঐক্যের কথা উল্লিখিত লেখক-বৃন্দ অতি সংক্ষেপে ছুঁয়ে গিয়েছেন, তা'ই এই পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়।

এখানে বলে রাখা ভাল যে বর্ত্তমান আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয়, একটি খসড়া মাত্র। মানব সভ্যতার বিকাশের কয়েকটি সাধারণ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে দু'চারটি কথা আলোচনা করা হ'য়েছে। হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা যখন সত্যই প্রাণবান ছিল, সেই যুগে এদের বিকাশের ধারার মধ্যে এক আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বরাবরই এরা গোঁড়া, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও ছুঁৎমার্গকে উপেক্ষা করে চলেছে এবং সেখানে যা কিছু ভাল ও গ্রহণ-যোগ্য পেয়েছে, তা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। ধর্ম্ম-

জগতেও এই দুই সভ্যতার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এই একই কারণে উদারতম রূপ গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির উদারতা ও পরমত-সহিষ্ণুতার বিষয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই সম্পর্কে ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়—নাজরাণের খৃষ্টিয় সম্প্রদায়ের প্রতি হজরৎ মহম্মদ-প্রদত্ত ঐতিহাসিক সনদখানির মধ্যে। এই অপরূপ ঐতিহাসিক দলিলখানির ইংরাজী মর্ম্মার্থ উদ্ধৃত করছি আমীর আলির বই থেকে :—

"To (the Christians of) Najran and the neighbouring territories, the security of God and the pledge of His Prophet are extended for their lives, their religion, and their property —to the present as well as the absent and others besides ; there shall be no interference with (the practice of) their faith or their observances ; nor any change in their rights and privileges ; no bishop shall be removed from his bishopric ; nor any monk from his monastery, nor any priest from his priesthood, and they shall continue to enjoy every thing great and small as heretofore ; no image or cross shall be destroyed ; they shall not oppress or be oppressed ; they shall not practise the right of blood-vengeance as in the Days of Ignorance ; no tithe shall be levied from them, nor shall they be required to furnish provisions for the troops."*

(ভাবার্থ: নাজরাণ এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাগুলির খৃষ্টান অধিবাসিগণের—জীবন, সম্পত্তি ও ধর্ম্মমত সম্পর্কে—ঈশ্বর এবং তাঁর নবী এই অভয় বাণী দিচ্ছেন। তাদের ধর্ম্মে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোনও

---

* Ameer Ali—The Spirit of Islam. pp, 246-47. এই সনদ খানির বাঙলা মর্ম্মানুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য—মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ—মোস্তাফা-চরিত, পৃঃ ৭৫৬-৫৭

প্রকার হস্তক্ষেপ করা হ'বে না। তারা যে সুবিধা এবং অধিকারগুলি ভোগ করে আসছে সে'সবেরও কোনও পরিবর্ত্তন করা হ'বে না। কোনও পাদরী, পুরোহিত ও সন্ন্যাসীকে পদচ্যুত করা হ'বে না এবং তাঁদের সকল অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোনও ক্রুশ বা মূর্ত্তি নষ্ট করা হ'বে না। তাদের উপর কোনও রকম অত্যাচার করা হ'বে না—তারাও কা'রও উপরে অত্যাচার করবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ব্বর যুগে—ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে—রক্তমূল্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করবার যে প্রথা ছিল, তা তারা বর্জ্জন করবে। তাদের উপর কোনও কর ধার্য্য করা হ'বে না এবং সৈন্য-সামন্ত প্রতিপালনের জন্য কোনও বিশেষ ভার তাদের বহন করতে হ'বে না।) এর উপর কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু এক এক সময়ে আক্ষেপ হ'য়,—আজকের বিভ্রান্ত ভারতীয় মুসলমান সমাজ যদি মহাপুরুষ মহম্মদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কিয়দংশেরও অধিকারী হ'তেন! যাই হোক, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সংস্কৃতির মূল দৃষ্টিভঙ্গীর এই সাদৃশ্যটি ভারতে মুসলিম শাসনযুগের স্বরূপ বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। মুসলিম অভিযানের প্রারম্ভে, হিন্দু ও মুসলমান শাসকবর্গের মধ্যে যত সংঘর্ষই হ'য়ে থাক, তাকে শেষ কথা বলে গ্রহণ করা চলে না। দুটি সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সমস্ত কলহ-বিবাদকে ছাপিয়ে উঠে শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরের বোঝাপড়ার পথ সুগম করে দিয়েছিল। সভ্যতা বস্তুর ধর্ম্ম নয়, মূলতঃ মনের ধর্ম্ম, এবং ভারতের মধ্য যুগে হিন্দু ও মুসলিম মানসের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ যে বিরাট সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমরা আধুনিক ভারতবাসী সেই সম্পদের অধিকারী; এর মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার কল্পনা করাও অসম্ভব।

কি প্রণালীতে এই গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করা হ'য়েছে, অতি সংক্ষেপে এখানে তার পরিচয় দিই। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ নৃতত্ত্ব

ও ভাষাতত্ত্বের সাক্ষ্য অবলম্বন করে সাধারণ ভাবে ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ের প্রধান বক্তব্য বিষয় এই যে জাতি হিসাবে ভারতবাসী নানা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণে গঠিত এবং সংস্কৃতি হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেও বিভিন্ন দেশীয় নানা উপাদানের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতি বা সংস্কৃতিকে ভাগ করাটা ইতিহাস বা বিজ্ঞান কোনও কিছুরই সমর্থন পায় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ একই আলোচনার জের টেনে—হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার বিকাশের মূল সূত্রগুলি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখাবার চেষ্টা করা হ'য়েছে—যে এই দুই সভ্যতাই পরস্পরের সম্মুখীন হ'বার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত—ছুঁৎমার্গ-বিরোধী, প্রগতিশীল এবং গ্রহণেচ্ছু মনোভাবের পরিচয় দিয়ে এসেছে। সমন্বয়-প্রবণতা দুই সভ্যতারই দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব; সুতরাং বহিঃপ্রভাবকে অস্বীকার করবার বা ফিরিয়ে দেবার মত সঙ্কীর্ণতা তাদের ছিল না। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভারতে মুসলিম শাসনসময়ের যে চিত্র দেওয়া হ'য়েছে—তা'তে সেই যুগে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ অপেক্ষা—দুই সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিকটিতেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। সংঘর্ষের কাহিনী এই যুগের শেষ কথা নয়—সংস্কৃতি-সম্মিলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার রূপান্তর গ্রহণই এর বিশেষত্ব। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, কতগুলি ক্ষেত্রে সেই সমন্বয়ের সামান্য পরিচয় দেবার কিঞ্চিৎ প্রয়াস পেয়েছি—যদিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে।

উপসংহারে আবার বলে রাখি যে বর্ত্তমান বইখানি পূর্ণাঙ্গ নয়, একটি খসড়া মাত্র। বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সুদীর্ঘতর আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারতো এবং করাই হয়তো উচিত ছিল। ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটলে তাই করবার ইচ্ছা রইল। পাদটীকা ও গ্রন্থ-পঞ্জী সম্পর্কে এইটুকু বক্তব্য যে, তথ্যাংশ সম্পর্কে দৈবাৎ যদি কোনও পাঠক

তর্ক তোলেন বা জিজ্ঞাসু হ'ন, উক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি হয়তো তাঁর কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করতে পারে—এই ভরসায় ওগুলির উল্লেখ করা। গ্রন্থমধ্যে মৌলানা আক্রাম খাঁকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি আবার উক্ত পদ গ্রহণ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐ বিষয়ক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাবলী থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি—একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এখানে স্বীকার করছি। অনেক সময় ভেবে আশ্চর্য্য লাগে সঙ্গীতে অত গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি সমগ্রভাবে (এক অতি ক্ষুদ্র Indian Music নামক পুস্তিকাখানি ছাড়া) একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখলেন না কেন! এই বইখানি লিখবার সময় অনেকের কাছ থেকে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের সভ্যগণের উৎসাহ এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী দেখেছি। সরস্বতী প্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ এবং বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়ের কাছ থেকে যে সৌজন্য পেয়েছি তা চিরদিন মনে থাকবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ বসু ও সরস্বতী লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত আমাকে নানাভাবে ঋণী করেছেন। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—

৮নং গড়পাড় রোড,
কলিকাতা
দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৩

দিলীপকুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা
ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা

এক

ভারতীয় সভ্যতার পটভূমিকা

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি যখনই আলোচনা করতে বসেছেন তখনই একটি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট না হ'য়েই পারেনি। বিষয়টি হ'ল—ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য জাতি, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার একত্র সমাবেশ। সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোথাও, একটি বিশেষ দেশে এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখা যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভাষ্যকারদের তাই একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। সমস্যাটি হ'ল ভারতীয় সংস্কৃতির ও সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা। এই বহুমুখী সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে ভারতবর্ষ কি বৈচিত্র্যের মধ্যেও সংস্কৃতিগত কোনও ঐক্যস্থাপনা করতে পেরেছে ? না, এই বিভিন্ন ধারা পরস্পরের সঙ্গে মিশ না খেয়ে স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করে চলেছে ? অন্যান্য খুঁটিনাটির কথা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে দুটি বৃহৎ প্রভাব অনস্বীকার্য্য—প্রথমতঃ, হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব ; দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব। মূলতঃ

এই দুই ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবকে অবলম্বন করে ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাস গড়ে উঠেছে। সুতরাং উপরের প্রশ্নটিকে খানিকটা রূপান্তরিত করে সোজাসুজি বলা চলে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির যথার্থ মিলন কি কোনও দিন কি সাধিত হ'য়েছে, না এই দুই সংস্কৃতি ভারতের মাটিতে চিরকালই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেছে? বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। ঐতিহাসিক Vincent Smith ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sect." [১] (ভাবার্থ: ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা রাজনৈতিক একচ্ছত্রত্বের দ্বারা যতদূর সম্ভব হতে পারে, ভারতবর্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিকতর গভীর অন্তর্নিহিত ঐক্য বিরাজমান। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ প্রভৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্যকে এই ঐক্য ছাপিয়ে উঠেছে।) এই তো গেল ঐতিহাসিকের মত। অপরপক্ষে একশ্রেণীর রাজনীতিবিদের মুখে আমরা শুনি একেবারে উল্টো কথা। বর্ত্তমান সময়ের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাণ্ডারা—যেমন মহম্মদ আলি জিন্না সাহেব—তারস্বরে ঘোষণা করেছেন, ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান—এই দুটি প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়—বরাবরই দুটি পৃথক জাতি হিসাবে ভারতে অবস্থান করে এসেছে, তাদের মধ্যে কোনওদিনই কোনও ঐক্যবন্ধন ছিল না।

১। The Oxford History of India, Introduction p. x.

এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে কোনটি বিচারসহ তা নির্দ্ধারণ করতে হ'লে আমাদের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণগুলি নিজেদের যাচাই করে নিতে হ'বে।

ভারতের দুটি প্রধান ধর্ম্মকে অবলম্বন করে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক্ পৃথক্ জাতি গড়ে উঠেছে, এই ধারণার মূলে রয়েছে—“বিশুদ্ধ হিন্দু জাতি” এবং “বিশুদ্ধ মুসলিম জাতি”—এই দুই “বিশুদ্ধ জাতির” পরিকল্পনা। উপরিউক্ত মতবাদ যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা “ধর্ম্মসম্প্রদায়” ও “জাতি” এই দুটি কথাকে সমর্থবাচক হিসাবেই ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের বিচার করে দেখতে হ'বে “বিশুদ্ধ হিন্দু” এবং “বিশুদ্ধ মুসলিম” জাতিদ্বয়ের পরিকল্পনা বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের চোখে কতদূর সত্য। “ধর্ম্মসম্প্রদায়” এবং “জাতি” কথা দুটি ভারতের ক্ষেত্রে কতদূর সমর্থবাচক তাও আমাদের বিবেচ্য।

সুবিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ম্যারেট এক জায়গায় বলেছেন—“The old ideas about race as something hard and fast for all time are distinctly on the decline. Plasticity, or in other words, the power of adaptation to environment has to be admitted to a greater share in the moulding of mind and even of body than ever before.”[১] (ভাবার্থ: পূর্ব্বে “জাতি” বলতে অপরিবর্ত্তনীয় চিরন্তন কোনও কিছুকে মনে করা হ'ত, বর্ত্তমানে সেই মতবাদ ক্রমশঃই পরিত্যক্ত হচ্ছে। মানুষের মানসিক ও দৈহিক সংগঠনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংযোগ ও প্রভাব অধিকতররূপে স্বীকৃত হ'তে আরম্ভ করেছে।) দেখা যাচ্ছে যে নৃতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা আজকে তথাকথিত বিশুদ্ধ জাতি বা pure raceএর প্রত্যয়কে আমল দিতে নারাজ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার

১। Anthropology (London 1914) pp 92-93

প্রভাবে মানুষের দেহমনে অহরহ নবপরিবর্ত্তন হ'য়ে চলেছে বিজ্ঞান-কর্ত্তৃক একথা বর্ত্তমানে স্বীকৃত। ঐতিহাসিকের চোখেও এই একই সত্য ধরা দিয়েছে নূতনরূপে। তিনি দেখেছেন মানবসংস্কৃতির কোনও বিশেষ স্তরকে "বিশুদ্ধ" বলে মনে করা ভুল। প্রত্যেক স্তরেই রয়েছে তার পূর্ব্বতন এবং তার সমসাময়িক বিভিন্ন চিন্তাধারার ছাপ ও সংমিশ্রণ যার ফলে গড়ে উঠেছে প্রতি যুগে সংস্কৃতির নব নব অধ্যায়। কোনও প্রগতিশীল সভ্যতাই নিজের প্রভাব না রেখে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি। তাই প্রাচীন সংস্কৃতির একজন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিককে বলতে শুনি—"Most achievements that had proved themselves biologically to be progressive and that had become firmly established on a genuinely popular footing by the participation of wider classes were conserved even if temporarily fossilized." [১] (ভাবার্থ: পৃথিবীতে যে সকল কীর্ত্তি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণের অধিকাংশের মিলিত উদ্যমে গঠিত সেগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই; সাময়িক ভাবে অবলুপ্ত হ'লেও, স্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছে।) জাতি ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে "অবিমিশ্র" এবং "বিশুদ্ধ" বলে কোনও কিছু আছে কিনা—এ সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ যা বলেন তার উদাহরণ উপরে দেওয়া হ'ল। সুতরাং ভারতবর্ষে "হিন্দু" ও "মুসলমান" বলে দুটি বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র জাতি বর্ত্তমান এবং তাদের এই তথাকথিত পার্থক্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন—এ ধরণের যুক্তি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিচারে টিকবে কিনা সন্দেহ। হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতবর্ষের বুকে বহুদিন যাবৎ বিরাজ করবার পর এদেশে ইসলামের আগমন। তার পরে প্রায়

১। Gordon-Childe—What Happened in History. p. 250

৮০০ বৎসর ধরে হিন্দু ও মুসলমান ভারতে পাশাপাশি বাস করছে। এতেও কি ইতিহাসের অমোঘ বিধান জয়যুক্ত হয়নি, এরা পরস্পরের সঙ্গে মিশ খায়নি? এর পরেও কি তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে নিজের নিজের বিশুদ্ধি বজায় রাখতে পেরেছে?

প্রথমতঃ দেখা যাক জাতি কথাটির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করলে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের জাতি বিভাগটা কি রকম দাঁড়ায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হারবার্ট রিজলে সাহেবের নেতৃত্বে ভারতীয় জনসাধারণের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে তাকে সাতটি তথাকথিক নৃতাত্ত্বিক স্তরে ভাগ করা হয়। সংক্ষেপে সেই সাতটি স্তর হ'ল—(১) দ্রাবিড়ীয়, (২) আর্য্য, (৩) মঙ্গোলীয়, (৪) মঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয়, (৫) শক-দ্রাবিড়ীয়, (৬) আর্য্য-দ্রাবিড়ীয় এবং (৭) তুর্ক-ইরাণীয়। রিজলে বর্ণিত এই সপ্ত-জাতি বিভাগ নানা কারণে তাঁর পরবর্ত্তী নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি। এর প্রধান কারণ রিজলে সাহেব তাঁর উদ্ভাবিত জাতি-বিভাগে অনেকস্থলে ভাষা-নির্দ্দেশক শব্দকে জাতি-নির্দ্দেশক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হ'য়েছে যে "আর্য্য", "দ্রাবিড়" প্রভৃতি শব্দ এক একটি ভাষা বা ভাষা-গোষ্ঠীর সাধারণ নাম; ওই নামে কোনও বিশেষ "জাতি"র অস্তিত্ব ইতিহাসে কোনও দিন ছিলনা। রিজলে সাহেবের পরে রাগেরী, আইকষ্টেড, রমাপ্রসাদ চন্দ, হ্যাডন, বিরজাশঙ্কর গুহ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতবাসীকে নানা ভাবে ভাগ করেছেন এবং তার মধ্যে শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহের জাতি-বিভাগই বৈজ্ঞানিক সমাজে সমধিক স্বীকৃত হ'য়েছে। সেই জাতি-বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল[১] :—

১। ভারতীয় জাতি, উপজাতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহের বিস্তারিত আলোচনা ও মতামতের পরিচয় পেতে হ'লে Census of India 1931 Vol 1 দ্রষ্টব্য। অপেক্ষাকৃত সরল ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য তাঁর The Racial Element in the Population (Oxford Pamphlets on Indian Affairs No 22) সবচেয়ে ভাল।

(১) নেগ্রিটো –কোঁকড়া পশমের মত চুল, বেঁটেখাটো চেহারা, ছোট মাথা, পাতলা চিবুক, গায়ের রং ঘোর কালো বা বাদামী। আসামের আঙ্গামী নাগা, দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বিকুলম ও আন্নামালাই পাহাড়ের কাদির ও পালিয়ানদের মধ্যে এই জাতির কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

(২) আদি-অষ্ট্রেলীয়—আকৃতি দেহবর্ণ প্রভৃতিতে নেগ্রিটোদের সঙ্গে এদের লক্ষণীয় পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট না হ'লেও—নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এদের একটি পৃথক গোষ্ঠীতেই ফেলেছেন। ঢেউ খেলানো মাথার চুল এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ ভারতের কুরুম্ব, যেরুব, চেঞ্চু প্রভৃতি ও উত্তর ভারতের সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আদি-অষ্ট্রেলীয় স্তরের প্রতীক।

(৩) মঙ্গোলীয়—এই স্তরকে দুই শাখায় ভাগ করা হ'য়েছে, (ক) আদি-মঙ্গোলীয় যার দুটি উপশাখা—লম্বা মাথা বিশিষ্ট শ্রেণী এবং চওড়া মাথা বিশিষ্ট শ্রেণী এবং (খ) তিব্বতী-মঙ্গোলীয়। আদি-মঙ্গোলীয় শাখার বিশেষত্ব নাতিদীর্ঘাকৃতি, ক্ষুদ্র মুখমণ্ডল, চোয়ালের হাড় উঁচু, চ্যাপ্টা নাক, তেরছা চোখ ও স্বল্প কেশ। ব্রহ্মদেশে, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে এদের প্রভাব বর্ত্তমান। তিব্বতী-মঙ্গোলীয় গণের দীর্ঘাকৃতি, পরিষ্কার রং, লম্বা মুখমণ্ডল—তাদের বিশেষত্ব দান করেছে। সিকিম, ভুটান প্রভৃতি স্থানে এদের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয়—বা মেডিটেরানীয়ান—এর তিনটি শাখা, যথা, (ক) আদি ভূমধ্যসাগরীয়, (খ) ভূমধ্যসাগরীয়, (গ) প্রাচ্য বা ওরিয়েণ্টাল। প্রথম শাখার বিশেষত্ব লম্বা মাথা, মধ্যম উচ্চতা, কৃষ্ণ বর্ণ এবং কেশের স্বল্পতা। এর দৃষ্টান্ত, দক্ষিণ ভারতের তামিল ও তেলেগু ভাষী ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় শাখার বৈশিষ্ট্য—লম্বা মাথা, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার রং, অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতা। বর্ত্তমান সময়ে কোচিন,

ইন্দোর, বিহার প্রভৃতিতে এঁদের নিদর্শন পাওয়া যায়। তৃতীয় শাখার দ্বিতীয় শাখার সঙ্গে দৈহিক সাদৃশ্য খুব বেশী, কেবল প্রথমোক্তদের লম্বা ও সরু নাক (long and often convex) তাদের প্রভেদ ধরিয়ে দেয়। অধুনা সিন্ধু, রাজপুতানা এবং যুক্তপ্রদেশের কতকাংশে এই স্তরের চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়।

(৫) পশ্চিম দেশীয় চওড়া-মাথা-বিশিষ্ট জাতি (western Bracycephals),—এদের তিন ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে ; (ক) আলপাইন—মধ্যম আকৃতি, চওড়া মাথা, গোল মুখ, গাঁট্টা-গোঁট্টা, ঘাড়ে-গর্দ্দানে চেহারা। এই ছাঁদটা গুজরাট ও বাংলাদেশে লক্ষ্যনীয়। (খ) দীনারীয়—মাথা অপেক্ষাকৃত কম চওড়া, রং অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ, লম্বা। বাঙ্গালী ও কানাড়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। (গ) আর্মেনীয়—চওড়া মাথা, ফরসা রং, খর্ব্ব ও মধ্যম আকৃতি। এই জাতির বিশিষ্ট প্রতীক পশ্চিম ভারতের পারসীগণ।

(৬) নর্ডীয়—দীর্ঘাকৃতি, গাত্রবর্ণ গোলাপী, সরু নাক। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানগণের মধ্যে এই ছাঁদটা খুব সুস্পষ্ট।

এইতো গেল ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সম্মত নৃতাত্ত্বিক বিভাগ। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে নৃতত্ত্বের দিক থেকে ভারতবর্ষে কোনও একটি বিশেষ বিশুদ্ধ "জাতির" অস্তিত্ব আবিষ্কার করা কঠিন। বহু জাতির রক্তের সম্মিলনে আজকের ভারতবর্ষের জনসমাজ গড়ে উঠছে। এই "জাতি" গুলি তার বিভিন্ন পৃথক্ সত্তা হারিয়ে ফেলে এক ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছে। কেবল স্থানে স্থানে স্থানীয় অধিবাসীদের শারীরিক বিশেষত্ব আমাদের তাদের কথা মনে করিয়ে দেয় মাত্র ; কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ পৃথক বিশুদ্ধ অস্তিত্ব শুধু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেই নিবদ্ধ। তবু এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ; কারণ তা আমাদের "বিশুদ্ধি"র

প্রত্যয় ভেঙ্গে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে বহু জাতির সম্মিলনেই আমাদের উদ্ভব। এ সম্পর্কে আর একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে ধর্ম্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির ভিত্তিতে আমরা যখন ভারতবর্ষকে ভাগ করি, তখন সেই বিভাগ উপরে বর্ণিত নৃতাত্ত্বিক বিভাগের সঙ্গে খাপ খায় না। ভারতবর্ষের এক একটি সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এইরকম একাধিক নৃতত্ত্বসম্মত "জাতি"র প্রতিভার সংমিশ্রণে; ভাষাতত্ত্বের উদাহরণ গ্রহণ করলে দেখা যায় যে অষ্ট্রিক ভাষা—আদি মঙ্গোলীয়, আদি অষ্ট্রেলীয় এবং নেগ্রিটো—সব কটি "জাতি" অল্পবিস্তর ব্যবহার করত। তেমনি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-গত বিভাগের সঙ্গে ভারতের এই বৈজ্ঞানিক "জাতি"বিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। এক ধর্ম্মসম্প্রদায় এমন একাধিক নৃতাত্ত্বিক জাতির সংমিশ্রণে তৈয়ারী। এক কথায় ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে কোনও জাতির অস্তিত্ব নেই। উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিক জাতিবিভাগ হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কোনও বিশুদ্ধ-রক্ত জাতির পরিকল্পনা করাটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক।

নৃতত্ত্ব-সম্মত "জাতি" বা race হিসাবে ভারতবাসীকে কি ভাবে ভাগ করা যায় তা আমরা দেখলাম; এবং সুদীর্ঘকাল পরস্পরের প্রতিবেশী হিসাবে বাস করবার ফলে এই জাতিগুলি অনিবার্য্যভাবেই তাদের বিশুদ্ধি রক্ষা করতে অসমর্থ হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে গভীর ভাবে মিশে যায় এটাও পরীক্ষিত সত্য। ভাষা গোষ্ঠী ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতবাসীকে কি ভাবে ভাগ করা যায় এখন সেই আলোচনায় আসা যাক। ভাষাতত্ত্বের বিচারে দেখা যায় যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা ও উপভাষাগুলির ভিতর নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ভাষাগুলির প্রভাব বর্ত্তমান:—(১) অষ্ট্রিক, (২) দ্রাবিড়, (৩) ইন্দো-ইউরোপীয়

বা আর্য্য, (৪) ভোটচীন এবং (৫) আরবী, পারসী।[১] অষ্ট্রিক গোষ্ঠীয় ভাষা ভারতবর্ষে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এই ভাষাভাষীরা ভারতে আগমন করে খুব সম্ভব উত্তরপূর্ব্ব দিক থেকে এবং এই আগমনের কাল হ'ল প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সংঘবদ্ধ, সুসভ্য জীবনের পত্তন অষ্ট্রিক ভাষাভাষীদের দ্বারাই আরম্ভ হয়। আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির কতকগুলি মৌলিক উপাদান এদের কাছ থেকেই এসেছে। চাষবাস, পশুপালন, কাপড় বোনা প্রভৃতি ভারতের মাটিতে এরাই প্রথম প্রবর্ত্তন করে। বর্ত্তমান ভারতে প্রচলিত এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, (১) কোল বা মুণ্ডা শ্রেণী, (২) খাসি বা খাসিয়া শ্রেণী ও (৩) নিকোবারী। এই সকল ভাষা লক্ষ্যণীয় সংস্কৃতির বাহক বা সাহিত্যে সমৃদ্ধ না হ'লেও এদের প্রভাব আধুনিক ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা গুলির উপর নেহাৎ কম নয়। ফরাসী পণ্ডিত ব্লক প্শিলুস্কি ও লেভি ভারতে প্রচলিত বর্ত্তমান আর্য্যভাষাগুলির মধ্যকার অষ্ট্রিক উপাদানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের প্রবন্ধাবলীর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকাতেও এসম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করা হ'য়েছে।[২] অষ্ট্রিকভাষীদের পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে দ্রাবিড়ভাষীরা এবং এরা সঙ্গে করে নিয়ে আসে এক বিরাট সংস্কৃতি ও সভ্যতা। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পাতে যে বিশাল প্রাগৈতিহাসিক নাগরিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তার জন্য সম্ভবতঃ আমরা দ্রাবিড়ভাষীদের কাছে ঋণী। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের, সাহিত্যের ও ঐতিহ্যের

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য" এবং "ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা" নামক মূল্যবান বই দুখানি এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ লিখতে সে দুখানি থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

২। P. C. Bagchi—Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India (Calcutta 1929) pp i—xxix; 3-32, 127-35 etc.

অনেকটাই দ্রাবিড়দের দান। ভারতের মাটিতে দ্রাবিড়ভাষী সভ্যতার সঙ্গে পূর্ব্বগামী অষ্ট্রিকভাষী সভ্যতার প্রথম ঘটে সংঘর্ষ ও পরে সমন্বয়, যার ফলে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী মিশ্র সভ্যতা। বর্ত্তমান ভারতে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চারিটি মুখ্য ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় যথা, (১) তেলেগু, (২) কানাড়ী, (৩) তামিল এবং (৪) মালয়ালম। এই প্রত্যেকটি ভাষায় লক্ষ্যণীয়, সমৃদ্ধ সাহিত্য বর্ত্তমান। আর্য্যভাষাসম্ভূত বর্ত্তমান উত্তরভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যেও দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। এমন কি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও বহু মূলতঃ দ্রাবিড়শব্দের প্রয়োগ বিরল নয়। উদাহরণ স্বরূপ উপনিষদোক্ত "মটচী" শব্দটির উল্লেখ করা চলে।[১] শব্দটি মূলতঃ কানাড়ী এবং "পঙ্গপাল" অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে। এ রকম আরও বহু শব্দ আবিষ্কৃত হ'য়েছে।[২] আবার দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের উপর আর্য্যভাষা সংস্কৃতের প্রভাব প্রচুর। ভাষা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষায় প্রচলিত বিস্তর সংস্কৃত এবং প্রাকৃত শব্দের সন্ধান পেয়েছেন। এদের উচ্চারণ মূলের থেকে অনেক পৃথক হলেও সংস্কৃতজ ও প্রাকৃতজ বলে চিনতে অসুবিধা হয় না। গোপালন, যব ও গম প্রভৃতির চাষ, শিব ও উমা, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের আরাধ্য ও আরাধ্যা দেবদেবীদের পূজা দ্রাবিড়ভাষীগণ ভারতে প্রচলিত করে বলেই অনুমান করা হয়। দ্রাবিড়-ভাষীরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে উত্তরপশ্চিম দিক থেকে। এর পরে ভারতবর্ষে আবির্ভাব হয় আর্য্যভাষাভাষীদের এবং এই অভিযান এসেছিল পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রাবিড়সভ্যতারই মত উত্তরপশ্চিম থেকে। বিরাট বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা এই আর্য্যভাষীগণের সম্পর্কে অনেক

১। ছান্দোগ্য ১।১০।১

২। Kittel—Kanarese Dictionary—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

আলোচনা হয়েছে। বাহুবলে এবং যুদ্ধোপকরণে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অপেক্ষা প্রবলতর হওয়ায় এরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় ক'রে এদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আধুনিক কালে এই আর্য্যভাষাসম্ভূত নানা প্রাদেশিক ভাষা, উপভাষাই ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে—বিশেষতঃ উত্তর ভারতে—প্রচলিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের মানসিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন ছিল এই আর্য্যভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত ও তৎসম্ভূত প্রাকৃত ও পালি ভাষায় যে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা সর্ব্বকালের জন্য বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের গৌরব বাড়িয়েছে এবং ভারতে বর্ত্তমান প্রচলিত আর্য্যভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলির সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রকাশের পিছনেও তার প্রভাব রয়েছে প্রচুর। আর্য্য-ভাষাভাষীরা ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিল তাদের নিজস্ব বিচিত্র সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, ইরাণীয় প্রভৃতি পশ্চিম এসিয়ার নানা উন্নত সভ্যতার প্রভাবে সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় মিশ্র-সভ্যতার সঙ্গে আর্য্যভাষীদের সভ্যতার প্রথমে ঘটলো সংঘর্ষ এবং ক্রমশঃ হল সমন্বয়। এর ফলে উদ্ভব হল এক বিচিত্র বলিষ্ঠ মিশ্র সভ্যতার। আর্য্যভাষীদের হোমযজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণের আধিপত্য যেমন অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়ভাষীরা মেনে নিল তেমনি আর্য্যভাষীরা ভারতের প্রাক্-আর্য্যসভ্যতার প্রভাব এড়াতে পারল না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম আবার জয়যুক্ত হল। সুতরাং আর্য্যসভ্যতা বলতে যা বোঝায় তা কোনও অর্থেই "বিশুদ্ধ" সভ্যতা নয়। ভারতবর্ষে আর্য্যভাষার পরবর্ত্তী আগন্তুক ভোটচীন ভাষা,—মঙ্গোল জাতীয় মানুষের মূল ভাষারূপে ভারতবর্ষে এর প্রবেশ ঘটে পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব থেকে। নেপাল, বাঙ্গলার কতক অঞ্চল ও আসামের অনেকাংশে আজও এই জাতীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। গারো, নাগা,

মণিপুরী, লুশেই প্রভৃতি ভাষা তার উদাহরণ। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় এই ভাষাগোষ্ঠীর দান অকিঞ্চিৎকর হলেও বাঙ্গলা, অসমীয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক আর্য্যভাষার উপর এর প্রভাব যে পড়েনি, তা নয়। অপরপক্ষে ভোটচীন-ভাষীরা বহুল পরিমাণে আর্য্যভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ আর্য্যভাষা গ্রহণ করবার দিকে এগোচ্ছে। ঐতিহাসিক আদানপ্রদানের দৃষ্টান্ত এখানেও মেলে। মুসলিম অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আরবী এবং আর্য্যভাষাসম্ভূত এবং সেমিটিক প্রভাবান্বিত পারসী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই দুই ভাষাই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে বিশ্বের দরবারে প্রসিদ্ধ হ'য়েছে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের শাসকদের ভাষা হিসাবে এই দুই ভাষা ভারতবর্ষে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজভাষা হিসাবে পারসী সেই যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট বাহন হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানীয় ভাষাগুলি আরবী ও পারসীর সংস্পর্শে এসে উক্ত ভাষাদ্বয়ের বহু শব্দাদি গ্রহণ করে। তাছাড়া আরবী ও পারসী ভাষার প্রভাব উত্তর ভারতে বহুলাংশে প্রচলিত সংস্কৃতবহুল হিন্দীর উপর প'ড়ে উর্দ্দু নামক একটি অতি মনোরম ভাষার সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে এই শেষোক্ত ভাষা ভারতীয় জনসাধারণের এক উল্লেখযোগ্য অংশের কথ্যভাষা এবং এতে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যও ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃতির আদানপ্রদান মুসলমান যুগেও পুর্ণোদ্যমেই চলেছিল।

দুই

হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার বিকাশ

ভারতবর্ষের উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পটভূমিকায় ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা করলে তার স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। প্রথমতঃ তথাকথিত হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির কথাই ধরা যাক। দেখা যাচ্ছে—কোনও বিশুদ্ধরক্ত "জাতি" এই সভ্যতা সৃষ্টি করেনি এবং সভ্যতা হিসাবেও তা কোনওক্রমেই বিশুদ্ধ নয়; বহু বিচিত্র, বিভিন্ন এমন কি বিদেশী প্রভাব ও উপাদান তাকে তার বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। এক কথায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মকে মেনে নিয়ে—বহুজাতি ও সংস্কৃতির পরস্পরের মিশ্রণে ও সমন্বয়ে। প্রথমে প্রাক্-মুসলমান যুগের কথাই আলোচনা করব, কেননা, মুসলিম শক্তির আগমনের পর ভারতের মাটিতে হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার পাশাপাশি অবস্থান ও তার ঐতিহাসিক ফলাফলের বিষয়ে যথাস্থানে—কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে—আমাদের আলোচনা করতে হ'বে।

প্রাক্-মুসলমান যুগের ভারতবর্ষের গৌরবময় যে ক'টি অধ্যায়ের কথা আমরা জানতে পেরেছি সেই সবগুলির সম্পর্কেই ঐতিহাসিকরা এক-বাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে সে'সব যুগ বিভিন্ন রক্ত ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি। খুব সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পাতে যে সুবিশাল প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার আলোচনা করলে আমরা কি দেখি? সে সকল স্থানে প্রাপ্ত নরকরোটি ও নরকঙ্কাল পরীক্ষা করে পণ্ডিতমণ্ডলী

উক্ত অঞ্চলে সেই যুগে অন্ততঃ চারিটি ভিন্ন-রক্ত-বিশিষ্ট জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে যাঁর মতামত প্রামাণ্য, এমন একজন পণ্ডিতের উক্তি খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল—"As far as its history can be traced, the population of Sind and the Punjab, had been a blend of many diverse elements and there is no reason for assuming that it was other than heterogeneous in the earlier age with which we are now concerned."[১] (ভাবার্থঃ—পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের ইতিহাস আমরা যতদূর জানতে পারি, তাতে দেখা যায় এসকল স্থানের লোকসংখ্যা নানা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। বর্ত্তমানে আমরা যে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের কথা আলোচনা করছি, সে যুগেও অবস্থা অন্যরকম ছিল—একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই।) বহিঃ-প্রভাবের দিক থেকেও সমসাময়িক ইজিপ্টীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার যোগাযোগ এবং এর উপর সুমেরীয় প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর পরবর্ত্তী লক্ষণীয় গৌরবময় সময় বৈদিক যুগ। আর্য্যভাষাভাষী আগন্তুকদের দ্বারা বৈদিক সভ্যতা সৃষ্ট হ'য়েছিল। কিন্তু আমরা দেখছি "আর্য্য" বলতে কোনও একটি বিশেষ জাতি বোঝায় না—বোঝায় বিভিন্ন রক্তের বা জাতির লোক সমন্বিত এক ভাষাভাষী একটি গোষ্ঠী। আর্য্য এই সাধারণ ভাষার নাম কোনও জাতির নাম নয়।[২] ভারতে আগত আর্য্যসভ্যতা তার পুর্ব্বেকার প্রাক্-আর্য্য ভারতের অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভাষী সভ্যতার সঙ্গে নিজের একটি চমৎকার সমন্বয় করে নিয়েছিল। ভারতের শেষোক্ত

১। Marshall—Mohenjodaro and the Indus Civilization Vol i p. 109

২। Huxley, Haddon and Carr-saunders প্রণীত We Europeans গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা যে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সম্মিলিত সৃষ্টি তাতো আমরা প্রথমেই দেখেছি। সুতরাং *একথা* বলতে *বাধা* নেই যে বৈদিক সভ্যতার ভিত্তিই ছিল নানা বিভিন্ন রক্ত ও ভাবধারার সংমিশ্রণের উপর। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনার শৈশবে পণ্ডিতগণ অনেক সময়ে এক ভাষা-ভাষী গোষ্ঠীকে একটি বিশুদ্ধ-রক্ত জাতি বলে ভুল করতেন ; ফলে বৈদিক সভ্যতাকে বিশুদ্ধ আর্য্যসভ্যতা বলে হাঁকডাক করবার একটা প্রবল ঝোঁক কিছুদিন ধরে দেখা গিয়েছিল। বর্ত্তমানে বৈদিক সভ্যতার মিশ্রণ-মূলক ভিত্তি প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন এবং পূর্ব্বতন পণ্ডিতদের বিষম ভুল সম্পর্কেও সচেতন হ'য়েছেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত এ বিষয়ে যা বলেছেন, তার খানিকটা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—"But it seems a great mistake has been made by the European scholars by confounding the word "Aryan" with the peoples who speak Indo-European or Indo-Germanic group of languages. It seems that the language has been identified with the race. It is clear that the present-day peoples of the world who speak the above-mentioned language group are not homogeneous in their somatic charactarstics."[১]। (ভাবার্থঃ—"আর্য্য" শব্দটিকে ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-জার্ম্মাণীয় ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে সমর্থবাচক ভেবে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভুল করেছেন। ভাষা ও জাতিকে সমর্থ-বাচক মনে করে গোলমাল করে ফেলা হ'য়েছে। বর্ত্তমান জগতে যারা উপরিউক্ত ভাষা ব্যবহার করে তারা জাতি হিসাবে এক গোষ্ঠী-ভুক্ত নয়।) বহিঃপ্রভাব এবং ভারতের বাহিরের সভ্যতাগুলির সঙ্গে

১। B. N. Dutta—Studies in Indian Social Polity p. 92.

আদানপ্রদানের ব্যাপারেও বৈদিক সভ্যতা পিছিয়ে ছিল না। পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতাগুলি ও ইরাণীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।[১]

পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক যুগগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরলে দেখা যাবে, যে পথে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে তা স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ছুঁৎমার্গের ঠিক বিপরীত। সম্ভবতঃ নানা রক্তের সংমিশ্রণ ও বহিঃপ্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়ার সুস্থ মনোবৃত্তির ফলেই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির জগতে এমন একটি উদার পরমতসহিষ্ণুতার আবহাওয়া সৃষ্ট হ'য়েছিল, যা পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে বিরল। ইউরোপের ইতিহাস যেমন ধর্ম্মযুদ্ধে কলুষিত, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন রক্তক্ষয়কারী সংঘর্ষ প্রায় ঘটেনি বললেই চলে। স্থানাভাবে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। মোটামুটি, মৌর্য্যযুগ, কুষাণযুগ, গুপ্তযুগ ও হর্ষবর্দ্ধনের যুগ—এই চারিটি ঐতিহাসিক যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট বোঝা যাবে। মৌর্য্য শক্তি রণক্ষেত্রে গ্রীকদের বিরোধিতা করেছিল বটে—কিন্তু তা' দাঁড়িয়েছিল পারসীক ও গ্রীকসভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানগুলিকে সাদরে গ্রহণ করে' ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটিয়ে—সেই স্বাস্থ্যকর সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ভিত্তিতে। মৌর্য্যযুগের শিল্পে পারসীক ও গ্রীক প্রভাবের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পী সেই প্রভাবকে গ্রহণ করেছে স্বীয় উদারতাবশতঃ এবং নিজ প্রতিভার জারকরসে তাকে জীর্ণ করে সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য[২]। সমসাময়িক

১। এ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় সরল ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—বিজয় চন্দ্র মজুমদার প্রণীত প্রাচীন সভ্যতা পৃঃ—৭০-৭৫; (গ্রন্থকারের সমস্ত মতামত বর্ত্তমানে অনেকে হয়তো মানতে চাইবেন না—তবু এত প্রাঞ্জল আলোচনা বাংলা ভাষায় বিরল।)

২। Percy-Brown—Indian Architecture Vol. I chapter III; Smith-Asoka (3rd. ed.) pp 135 ff.

গ্রীক সভ্যতার প্রতি মৌর্য্যভারতের দৃষ্টিভঙ্গী কতটা উদার ও সঙ্কীর্ণতার মোহমুক্ত ছিল তার পরিচয় আমরা পাই মৌর্য্যবংশ ও সেলিউকাস বংশের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনায় এবং মৌর্য্যনৃপতি বিন্দুসারের গ্রীক দর্শন শিক্ষার আগ্রহে।[১] গ্রীকসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি এই উদার ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব বহু পরবর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। শক-কুষাণ যুগে এর বিশেষ নিদর্শন আমরা পাই। ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট এবং সেই কারণে যথাস্থানে ঋণ স্বীকার করে গ্রীকদের জ্যোতিষজ্ঞানের প্রগাঢ়-তার কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন ভারতীয় জ্যোতিষী বরাহমিহির।[২] অপরপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে গ্রীকদের বরাবরই একটি সশ্রদ্ধ গ্রহণেচ্ছু মনোভাব ছিল এবং স্বীয় ধর্ম্ম ও দর্শনে ভারতীয় প্রভাবকে গভীর ভাবে গ্রহণ করতে তারা দ্বিধা করেনি।[৩] ধর্ম্মের ক্ষেত্রে উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার দিক থেকে তো মৌর্য্যযুগ ভারত-বর্ষের ইতিহাসে, এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসে, বিখ্যাত হ'য়ে আছে। এই যুগেই মৌর্য্যরাজ অশোক তাঁর সুবিখ্যাত অনুশাসনগুলিতে প্রচার করেন যে তাঁর রাজত্বে যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী লোক যে কোনও স্থানে বাস করতে পারবে। তিনি আরও প্রচার করেন যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণের পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মমত শ্রদ্ধাসহকারে শোনা উচিত—

১। McCrindle-Invasion of India by Alexander the Great p. 409

২। বৃহৎ সংহিতা ২।১৫

৩। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক Tarn তাঁর The Greeks in Bactria and India গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে অন্যান্য জাতি সম্পর্কে অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করলেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে গ্রীকরা বরাবরই কিছুটা শ্রদ্ধাবান ছিল। গ্রীক মানসের উপর ভারতীয় প্রভাব সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ প্রণীত Eastern Religions and Western Thought গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এতে সব ধর্ম্মেরই মহিমা বৃদ্ধি পায়। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হলেও অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করে চলতেন। পরধর্ম্মমতসহিষ্ণুতা বা religious toleration এর দিক থেকে মৌর্য্যযুগ প্রায় আদর্শ যুগ। পরবর্ত্তী শক-কুষাণ যুগের বিশেষত্ব একই ধরণের। মধ্য এশিয়ার দুদ্ধর্ষ অভিযানকারীদের সেদিনকার ভারতবর্ষ নাসিকাকুঞ্চিত করে দূরে সরিয়ে রাখেনি। নিজের সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সাহিত্য, দর্শনের দ্বার তাদের জন্য সাদরে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বিনিময়ে তারাও ভারতবর্ষকে স্বদেশ ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিজস্ব সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে আশোকের পাশেই বিদেশী কুষাণরাজ কণিষ্কের স্থান। বৌদ্ধ শিল্পের ইতিহাসে শক-কুষাণ যুগের গ্রীকশিল্পীদের অবদান অসামান্য। শিল্পের আদর্শের দিক থেকে এই প্রচেষ্টাকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু ভারতের মূর্ত্তি-শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাসে পথপ্রদর্শক হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান এই শিল্প নিশ্চয় দাবী করতে পারে।[১] ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে শক-কুষাণ সংস্কৃতির যোগাযোগ ও মিলনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি সেই যুগে ধর্ম্মমতের আশ্চর্য্য স্বাধীনতা ও অদ্ভূত পরমত-সহিষ্ণুতা। গোঁড়া বৌদ্ধ হ'য়েও সম্রাট কণিষ্ক—হিন্দু, ইরাণীয় ও গ্রীকধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করেননি।[২] এবং কুষাণযুগে সর্ব্বসাধারণের যে ধর্ম্মমত সম্পর্কে সম্পূর্ণ এবং অকুণ্ঠ স্বাধীনতা ছিল তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় এ যুগের মুদ্রা, ক্ষোদিত লিপি প্রভৃতি থেকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর পরবর্ত্তী বিখ্যাত যুগ—গুপ্ত সম্রাটদের যুগ। একে আমরা প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতি-

---

১। Foucher—The Beginnings of Buddhist Art দ্রষ্টব্য।

২। Smith—The Early History of India (4th. ed.) pp 281 ff

হাসিক যুগ বলে অভিহিত করতে পারি। সাম্রাজ্য বিস্তার, বাণিজ্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতবাসী তখন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। কিন্তু এই সর্ব্বাংশে উন্নত অবস্থার মূল অন্বেষণ করে দেখলে দেখা যাবে এর পিছনেও ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বলিষ্ঠ, উদার, গ্রহণেচ্ছু দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে। ভারতের পুর্ব্বাঞ্চল হ'তে এই যুগেই ভারতবাসীরা সুমাত্রা, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যবিষয়ক, এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছে—এশিয়ার সর্ব্বত্র ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রচার করবার প্রয়াস পেয়েছে। মধ্য এসিয়া, তুর্কীস্থান ও চীনদেশের সঙ্গে সংস্কৃতি লেন-দেনের কারবার এইযুগের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। আবার পশ্চিমে বিরাট রোমান সভ্যতার সঙ্গেও গুপ্ত-ভারতের যোগাযোগের বিষয় জানতে পারা যায়। সম্প্রতি ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ থেকে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের তত্ত্বাবধানে ভারতের যে জাতীয় ইতিহাস বহু খণ্ডে ক্রমশঃ প্রকাশিত হ'চ্ছে, তার ষষ্ঠ খণ্ডে গুপ্তযুগ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হ'য়েছে—তা যথার্থ "………the little that we know is enough to show that India did not lead an isolated life, but kept contact with the great civilizations of the west through trade and commerce and this led to political and cultural relations. Such relations………. were fairly constant and active, during the period under review."[১] (ভাবার্থঃ—আমরা যেটুকু জানি তাতে প্রমাণ হয় যে, আলোচ্য যুগে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটায়নি। পশ্চিমের বিরাট সভ্যতাগুলির সঙ্গে

১। A New History of the Indian People, Vol. VI (The Vākātaka-Gupta Age) p. 341

ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যমে সে যথেষ্ট সংযোগ রক্ষা করেছিল এবং এর থেকে ক্রমশঃ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।...... এই যোগাযোগ যথেষ্ট স্থায়ী ও সক্রিয় ছিল।) সকল প্রকার সঙ্কীর্ণ পরিধিকে এই যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি যেমন তুচ্ছ করেছিল তেমনই সকল ক্ষেত্রেই তার দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছিল অপুর্ব্ব উদারতা। ধর্ম্মক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম নয়। দেশে এই সময় সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলে কোনও তথাকথিত সমস্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজবংশ বৈষ্ণব হলেও প্রজাদের ধর্ম্মমতের পুর্ণ স্বাধীনতা ছিল। গুপ্ত-সম্রাটেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের উচ্চ রাজপদ দিতে দ্বিধা করতেন না। পরম বৈষ্ণব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বৌদ্ধ সেনাপতি ও শৈব রাজমন্ত্রী ছিলেন। এক ধর্ম্মাবিলম্বী হয়েও রাজারা ভিন্নধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন—এ দৃষ্টান্তও মোটেই বিরল নয়। জনসাধারণের মধ্যে যে এ যুগে পরমত সহিষ্ণুতা এবং পরস্পরের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের উপর শ্রদ্ধা কতটা বেশী ছিল, তার কিছু পরিচয় বহন করেছে এই যুগের খোদিত লিপিগুলি।[১] বিভিন্ন ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতের বিরোধ অবশ্যই ছিল; কিন্তু তা পুঁথির পাতায় ও বিরোধ-সভায় আবদ্ধ থাকতো—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার অস্তিত্ব অজানা ছিল। উত্তর ভারতের ইতিহাসে পরবর্ত্তী সর্ব্বজনবিদিত বিখ্যাত যুগ—সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল। এই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই চীনদেশীয় পর্য্যটক হিউএন সাঙএর বর্ণনায়। তার থেকে যে ছবিটি ফুটে ওঠে পুর্ব্বেকার চিত্রগুলির সঙ্গে সে ছবির খুব তফাৎ নেই। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ধারা সে যুগেও পুর্ণমাত্রায় চলেছিল এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃতির লেনদেনও অটুট ছিল। ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-জগৎ

১। Ibid pp 364-68

উদারতা ও সহনশীলতার ব্যাপারে আগেকার সুনাম বজায় রেখেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সম্রাট হর্ষ শৈব ও সৌর ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং বৌদ্ধেতর অন্যান্য ধর্ম্মকেও সম্মান ও আনুকূল্য দেখিয়েছেন।[১] হিউএন সাঙের বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে এই যুগে জনসাধারণের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্ম্মমতের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব সম্ভব হ'য়েছিল। দুটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া উগ্র সাম্প্রদায়িকতার কোনও উদাহরণ এই যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না। হর্ষের পর থেকে ভারতে ইসলাম অভিযানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুগকে কিছুকাল আগে ভারত-ইতিহাসের "অন্ধকার" যুগ বা অবনতির যুগ বলে বর্ণনা করা হ'ত। বর্ত্তমানে ঐতিহাসিকদের সেইমত কিছু পরিমাণে বদলেছে। এই যুগে অবশ্য দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে কিছুটা অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু এই কলহ-বিবাদকে চরম বলে ধরলে ভুল হবে। এটা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। আরও একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে এই অসহিষ্ণু মনোভাবের উৎপত্তিস্থল অনেক সময়েই জনসাধারণের অসহিষ্ণুতা নয়, শাসনরত নৃপতির খেয়াল। বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ এযুগেও ভারতবর্ষ হারিয়ে ফেলেনি। দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ রাজবংশগুলির মধ্যে কয়েকটির ইতিহাসে চীন, সিংহল ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ লক্ষ্যণীয়।

সুতরাং ভারতবর্ষের হিন্দুযুগের ইতিহাস আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের বাধা নেই যে "হিন্দু" বলতে কোনও একটি বিশুদ্ধ-রক্ত, ছুঁৎমার্গী, গণ্ডীবদ্ধ "জাতি" বোঝায় না—তা বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাধারণ

১। R. K. Mookherje—Harsha pp 144-45

নাম। এই সভ্যতার গৌরবের যুগে এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার, বিশ্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক। আপনার সীমার বাইরে যা কিছু ভাল ও গ্রহণীয় তাকে আপনার করে নিতে, আপনার করে নিয়ে নিজের সীমা সদা-সর্ব্বদা প্রসারিত করে পথ চলতে এই সভ্যতা কখনও দ্বিধা করেনি। কোনও সঙ্কীর্ণ সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক সংস্কার এ ব্যাপারে তার পথরোধ করতে পারেনি। হিন্দু সভ্যতার এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী তাকে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরমত-সহিষ্ণু করেছে; ইউরোপের মত ভারতবর্ষে হিন্দুযুগে ধর্ম্মক্ষেত্র কখনও ব্যাপকভাবে কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়নি। হিন্দু নামে পরিচিত জনসাধারণের মধ্যে যে ঐক্য আমরা লক্ষ্য করি তা নানা বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে তার ভিত্তিতে সংস্কৃতিগত ঐক্য গড়ে তোলাই হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের ভাষায়—"It cannot be denied, that in a few centuries, the spirit of cultural unity spread through a large part of the land, and racial stocks of varying levels of culture became steeped in a common atmosphere."[১] (ভাবার্থঃ—কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সংস্কৃতিগত ঐক্যের আদর্শ ভারতের অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নানা বিচিত্র সংস্কৃতি-সম্পন্ন বিভিন্ন জাতিগুলি এই ঐক্যের আদর্শ গ্রহণ করেছিল।)

উপরে যে প্রণালীতে হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল সেই একই প্রণালী অবলম্বন করে ইসলাম ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রথমে ভারতে আগমনের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত ইসলামের ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। আরব দেশে ইসলামের অভ্যুদয় হ'য়েছিল। নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে আরবে

১। Radhakrishnan—The Hindu View of Life. p. 14

কোনও একমাত্র বিশুদ্ধ-রক্ত জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এখানে প্রধানতঃ সেমাইটদের প্রভাব বেশী। তাদের আকৃতিগত বিশেষত্ব হ'চ্ছে—ভ্রমরকৃষ্ণ চুল, খাড়া ও ঋজু নাক এবং লম্বাটে মুখমণ্ডল। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আরববাসিদের মধ্যে প্রাচীন হামিটিক জাতির একটি স্তরও ধরা পড়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ আরবে পামিরীয় বা আর্ম্মেণীয় চওড়া মাথা বিশিষ্ট জাতির এককালে আগমন ও স্থানীয় অপরাপর জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছিল নৃতাত্ত্বিকগণ এ'রকম অনুমানও করে থাকেন।[১] সুতরাং এই ক্ষুদ্র হিসাবের ফলে দেখা যাচ্ছে ইসলামের জন্মদাতা আরবজাতি একাধিক নৃগোষ্ঠির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এবং নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানকে যদি শ্রদ্ধা কর'তে হয় তাহ'লে একথা কখনই বলা চলে না যে আরবদেশে এক "বিশুদ্ধ রক্ত" জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম আবির্ভূত হ'য়েছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পুর্ব্বে আরবদেশের সংস্কৃতি জগতে প্রধানতঃ তিনটি ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ প্রাক্-ইসলাম পৌত্তলিক আরবের নিজস্ব সংস্কৃতি যা খুব উচ্চস্তরের ছিল না। জীবনের প্রতি একটা বলিষ্ঠ, বেপরোয়া, প্রায়-উচ্ছৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এর বিশেষত্ব। দ্বিতীয় স্থান দিতে হয় ক্রীশ্চান ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে। এই ধর্ম্ম তখন তার কৈশোরে এবং প্রচারকদের উদ্যমে তার প্রভাব বহু-বিস্তৃত। তৃতীয়তঃ আরবমানসে ইহুদী ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব ও উল্লেখযোগ্য। প্রাক্-ইসলাম আরবের নিজস্ব পৌত্তলিক চিন্তাধারার উপর—ক্রীশ্চান ও ইহুদী প্রভাবের ফলে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই আরবদেশের একদল চিন্তাশীল লোকের মনে প্রচলিত

১। Haddon—The Races of Man. pp 23, 95.

পৌত্তলিকতার প্রতি বিরাগ এবং একেশ্বর-বাদের একটি অতি ক্ষীণ আভাষ দেখা দিয়েছিল। একে ইসলামের পুর্ব্বাভাষ বলা যেতে পারে।[১] মহাপুরুষ হজরৎ মহম্মদ প্রবর্ত্তিত ইসলাম ধর্ম্ম যখন অত্যল্পকালের মধ্যেই—আরববাসীর চিত্ত জয় করে আরবে নবযুগ প্রবর্ত্তন করল, তখন সেই নূতন ও শক্তিশালী ধর্ম্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিদের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। ইসলামের মত প্রগ্রতিশীল ঐতিহাসিক শক্তির পক্ষে তার প্রতিপক্ষদের পরাজিত করতে বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু প্রবল বিরোধের মধ্যেও সমণ্বয়সাধনের প্রতিভা নিয়ে ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিল। তাই এব্রাহাম প্রভৃতির ন্যায় ইহুদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, যীশুর ন্যায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মুসলিম ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্মানিত স্থান পেলেন। ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রমতে অবশ্য মহম্মদ পৃথিবীর শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী (বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ) এবং তাঁর পরে আর কোনও নবী পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'বেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র মহম্মদের পুর্ব্ববর্ত্তী আরও কয়েকজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে স্বীকার করে—যথা, নোয়া, এব্রাহাম, ইসমাইল, আইজাক, জেকব, মুসা, যীশু, হব, আরন, সলোমন ও ডেভিড।[২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে ক্রীশ্চান ও ইহুদী ধর্ম্মগুরুদের একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় না করে তাদের স্বীকার করেই ইসলাম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল। এই ভাবে কখনও ইসলামকে ক্রীশ্চান প্রভাবের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে[৩],

---

১। Khuda Buksh—Contributions to the History of Islamic Civilization. Pp. 147-48.

২। কোর-আন্ ৪।১৬৩-৬৪

৩। ইসলাম ও ক্রীশ্চান ধর্ম্মের যোগাযোগ সম্পর্কে,—Bartold—Mussulmun Culture, Chapter I দ্রষ্টব্য। আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য Khuda Buksh—Op. Cit. pp. 5 ff.

কখনও বা তাকে ইহুদী সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হ'য়েছে। স্বীয় প্রাণশক্তির প্রবল বন্যায় যেমন ইসলাম সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে, তেমনি যেখানে যা কিছু গ্রহণযোগ্য সেটুকুকে গ্রহণ করবার মত উদারতা দেখাতেও সে কার্পণ্য করেনি। ইহুদী ও ক্রীশ্চান সভ্যতা ছাড়াও আরও দুটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরবের ইসলামী সভ্যতার বিশেষ সংযোগ ঘটেছিল—তা হ'ল গ্রীক এবং ইরাণীয় (পারসীক) সভ্যতা ও সংস্কৃতি। প্লেটো, আরিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীক চিন্তানায়কের রচনাবলীর সঙ্গে আরব চিন্তাজগতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং আরবী ভাষায় দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনামূলক বহুগ্রন্থই হয় উক্ত বিষয়ক গ্রীক গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ বা তার উপরে ভাষ্য।[১] এ ক্ষেত্রেও শেষে ইসলামের প্রতিভারই জয় হ'ল—এবং গ্রীক দার্শনিক চিন্তাকে গ্রহণ করে, গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকে তাকে অতিক্রম করে যাবার পথও ইসলাম আবিষ্কার করল।[২] প্রাচীন জগতে পারসীক সংস্কৃতির স্থান খুবই উচ্চ। ইসলাম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর আরব কর্ত্তৃক পারস্য-বিজয়ের ফলে পারস্যদেশে ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর পক্ষে বিজিত পারস্যের ভাষা, সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি আরবমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আজকের পৃথিবীতে পারসী ভাষা ও সাহিত্য ইসলামীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন। ইসলাম ও পারসীক সংস্কৃতির

১। O' leary—Arabic Thought and its Place in History p. 54; গ্রীক ও ইসলামীয় দর্শনের যোগাযোগ সম্পর্কে Arnold এবং Guillaume সম্পাদিত The Legacy of Islam গ্রন্থে Philosophy অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। কবি-দার্শনিক ইকবাল তাঁর the Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে সুন্দররূপে দেখিয়েছেন কি ভাবে ইসলামীয় দার্শনিক চিন্তা অবশেষে গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেছিল।

মিলনের একটি সুন্দর সাহিত্যিক নিদর্শন, পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি ফিরদৌসী-রচিত "শাহনামা" নামক সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের পারস্যের ঐতিহ্য ও পুরাণকথাকে সম্মানিত স্থান দেওয়া হয়েছে যদিচ সেই কারণে পারসী মুসলমানদের এই কাব্য উপভোগ করতে এবং তার জন্য গৌরববোধ করতে কোথাও বাধেনা। চিত্রকলা, স্থাপত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামের যে গৌরবময় অবদান তার অনেকখানিই পারসীক প্রভাবের ফল। ইসলামের সঙ্গে আর দুটি সভ্যতার যোগাযোগের উল্লেখও এখানে করা উচিত—তা হ'ল তুর্কসভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা। মঙ্গোলগণ কর্ত্তৃক ইরাণ, মেসোপটেমিয়া, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি বিজয়ের ফলে মুসলিম জগৎ তুর্কসভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং ইসলামীয় সভ্যতা ও তুর্কসভ্যতা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। আরব, পারস্যের উন্নততর সভ্যতা যেমন তুর্কমানসকে সংস্কৃত করে, তেমনি উদ্দাম-প্রকৃতি তুর্কদের সংস্রবে এসে মুসলমান সভ্যতার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হয়।[১] ভারতের বাইরে ইসলামীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার যোগাযোগ এবং ইসলামের উপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই দুই সংস্কৃতির মিলন ঘটে প্রধানতঃ পারস্যে। কথাসাহিত্য, গণিত, বীজগণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল।[২]

সুতরাং ভারতে আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইসলামীয় সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে যে বিশেষত্ব চোখে পড়ে তা হচ্ছে,—কোনও "বিশুদ্ধ-রক্ত" জাতির মধ্যে ইসলামের আবির্ভাব হয়নি; বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক স্তরের মিশ্রণে আরবদেশে যে জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল ইসলাম তাদের মধ্যেই

১। V. V, Bartold—Mussulmun Culture pp. 121-23
২। Ibid pp. 47-48

জন্মগ্রহণ করেছে। তার জয়যাত্রার পথেও ইসলাম কোনও দিন ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করেনি ; যেখানে যে কোনও উঁচুদরের সংস্কৃতির সঙ্গে তার সংস্পর্শ ঘটেছে, সে তার মধ্যে যা কিছু ভাল ও গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তার গৌরবময় যুগে নিজের বিশুদ্ধি বজায় রাখবার জন্য কোনও গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় ইসলাম নেয়নি। ক্রীশ্চান এবং ইহুদী ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি, গ্রীক, ইরাণীয়, তুর্ক ও ভারতীয় সংস্কৃতি সব কিছুর প্রভাবই ইসলামে রয়েছে, কিন্তু তাতেও ইসলামের স্বকীয় বিশেষত্বটি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এই উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টি ভঙ্গীর সঙ্গে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ব্ব-বর্ণিত অসাম্প্রদায়িক মনো-ভাবের বহুলাংশে মিল রয়েছে। ইসলামের উদার বিশ্বদৃষ্টি আরবের রাজনৈতিক জগতে কিভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছিল, তার একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে স্বয়ং হজরৎ মহম্মদের জীবিত কালের একটি আচরণ থেকে। প্রতিপক্ষদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রামের সময়ে হজরৎ মহম্মদ যখন মদিনায় এসে উপস্থিত হ'লেন, সেই সময় তাঁকে একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। মদিনায় তখন নানা পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল ; এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কি ভাবে এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এই ছিল মহম্মদের সমস্যা। কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি এই রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে অগ্রসর হ'য়েছিলেন, তা এখানে বর্ণনা করছি—বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি, মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের ভাষায়—তাঁর রচিত হজরৎ মহম্মদের সুপ্রসিদ্ধ জীবনচরিত থেকে—

"পরস্পর বিপরীত চিন্তা-রুচি ধর্ম্মভাব-সম্পন্ন ইহুদী, পৌত্তলিক, মুছলমানদিগকে দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলবিধানের জন্য একই কর্ম্মকেন্দ্রে সমবেত হইতে হইবে। তাহাদিগকে একটি রাজনৈতিক জাতি বা 'কওমে' পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে

হইবে যে একদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়সমূহ ধর্ম্মগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াও দেশমাতৃকার সেবামন্দিরে একত্র সমবেত হইতে পারে এবং এইরূপ হওয়াই কর্ত্তব্য।"[১] যে মহাপুরুষের প্রখর প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একটি "রাজনৈতিক জাতিতে" পরিণত করবার আদর্শ সাফল্যের সহিত গ্রহণ করেছিল, নিজেকে তাঁর অনুগামী বলে প্রচার করে মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব যখন ভারতের দুটি বিরাট ধর্ম্মসম্প্রদায়-হিন্দু ও মুসলমানকে দুই জাতিহিসাবে চিরদিনের জন্য স্বতন্ত্র করে দুটি রাষ্ট্রগঠন করবার স্বপ্ন দেখেন, এবং পাকিস্থান বা কাল্পনিক স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রের মহিমা কীর্ত্তন করে দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে বেড়ান, তখন তাঁর নিজের উপরিউক্ত রচনা তাঁর স্মরণে থাকে কি? জানতে বড় ইচ্ছা হয়! উদার মনোভাব ও সূক্ষ্ম দূরদর্শিতার ফলে ইসলাম বিশ্বের দরবারে এত অল্পসময়ের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছিল যে তা আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। নানা সংস্কৃতির ধারাকে স্বীয় প্রতিভাবলে নিজস্ব করে নিয়ে পার্থিব শক্তিসম্পদ অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাজগতেও ইসলাম হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সংস্কৃতির প্রধান বাহক—একথা ভুলে গেলে চলবে না। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে ইসলাম সে ইউরোপীয় রেণেশাঁ বা নবজাগরণের পথ বহুলাংশে পরিস্কার করে দিয়েছিল, একথা পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।[২]

১। মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ—মোস্তাফা-চরিত পৃঃ ৪৯৭; রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেতে হ'লে, আরও দ্রষ্টব্য—Ameer Ali—The Spirit of Islam (1902) pp. 245-46.

২। O'leary—Arabic Thought and its Place in History p. 295

তিন

ভারতে মুস্‌লিম-শাসন যুগ

উপরের আলোচনার ফলে দেখা গেল, ভারতের মাটিতে পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা ঐতিহাসিক নিয়মকে মেনে নিয়ে স্বাভাবিক ও সুস্থ ভাবেই বিকাশ লাভ করেছে। জাতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উভয়েই মিশ্রণকে মেনে নিয়েছে ও ছুঁৎমার্গকে পরিহার করে চলেছে। ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের পরে এই দুই সভ্যতার যখন পরস্পর সাক্ষাৎ হল, তখন তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল—তা বর্ত্তমানে আলোচ্য। দুঃখের বিষয়, যে সব ইউরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরাজ লেখকদের ঐতিহাসিক রচনা পাঠ করে আমরা অভ্যস্ত, তাঁরা প্রায় সকলেই ভারতের মধ্যযুগ বা মুসলমান শাসনের যুগকে বর্ব্বর যুগ বলে বর্ণনা করেই ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য সমাধা করেছেন। এর কারণও স্পষ্ট বোঝা যায়। মুসলমান যুগকে অন্ধকার যুগ বলে বর্ণনা করলে সেই পটভূমিকায় পরবর্ত্তী বৃটিশ শাসনের ইতিহাস খুবই উজ্জ্বল দেখায়। তাই প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে প্রায়ই আমরা দেখি যে মুসলমান যুগ ছিল বিরোধ, বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য ও বর্ব্বরতার যুগ। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কলহ, রাজাবাদশার অত্যাচার ও খামখেয়াল ছাড়া এ যুগে, উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নেই। এই বিশৃঙ্খলার অন্ধকারে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উদিত হ'য়েছিল নবোদিত সূর্য্যের মত আইন এবং শৃঙ্খলার বরাভয় নিয়ে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসারকে সমর্থন করতে গিয়ে এই শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ঐতিহাসিকগণ সত্যকে উপেক্ষা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দুজন ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। ঐতিহাসিক হাণ্টার স্পষ্টই কবুল করেছেন—মুসলমানী

আমলের কুশাসন এবং বর্ব্বরতার হাত থেকে ভারতবর্ষকে ইংরাজশক্তি বাঁচিয়েছে এবং এখানেই নাকি বৃটিশ সাম্রজ্যবাদের সার্থকতা। "Our reply is that when we came to look into Muhammadan administration of Bengal, we found it so one-sided, so corrupt, so adsolutely shocking to every principle of humanity, that we should have been a disgrace to civilisation had we retained it......under the Muhammadans, Government was an engine for enriching the few......It is only after we had begun to break away from the system......that the existence of the people disclosed itself."[১] (ভাবার্থ:—বাংলার মুসলমান শাসনতন্ত্র এত একদেশদর্শী, এত কলুষিত এবং মনুষ্যত্ব-বিরোধী ছিল, যে আমরা যদি তার উচ্ছেদ না করতাম তাহ'লে আমরা মানব সভ্যতার কলঙ্ক বলে পরিগণিত হতাম। মুসলমানদের অধীনে শাসনযন্ত্র অল্পসংখ্যক ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করবার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হত। আমরা সেই শাসন-প্রণালী উচ্ছেদ করবার পর জনসাধারণ মাথা তুলতে সক্ষম হ'য়েছিল।) অন্যত্র আর একজন ঐতিহাসিক-এলিয়ট বলেছেন, "If the intrinsic value of the works of the native historians are small, they will yield much that is worth observation, to anyone who will attentively examine them. They will make our native subjects more sensible of the advantages accruing to them under the mildness and equity of our rule......we should be spared the rash declarations, respecting

---

১। Hunter—The Indian Musalmans (1871) pp 160-61

Mohammadan India, which are made by persons not otherwise ignorant. We should no longer hear bombastic Babus, enjoying under our government the highest degree of personal liberty and many more political privileges than were ever conceded to a conquered nation, rave about patriotism and the degradation of their present position."[১] (ভাবার্থ :—এদেশীয় ঐতিহাসিকগণের রচনার মূল্য অকিঞ্চিৎকর হ'লেও সন্ধানী দৃষ্টিতে তাদের আর এক প্রকার প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়ে। এগুলি পাঠ করলে আমাদের এ দেশীয় প্রজাবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারবে আমাদের মৃদু ও ন্যায়পরায়ণ শাসনতন্ত্রের অধীনে থেকে তারা কত সুখ সুবিধা উপভোগ করতে পারছে।......ভারবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান যুগ সম্পর্কে অনেক সুবিজ্ঞ ব্যক্তির মনেও যে ভ্রান্ত ধারণা আছে তা দূর হ'বে। আমাদের শাসনাধীনে ভারতবাসীকে যে পরিমাণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে কোনও বিজয়ী শক্তি বিজিত জাতিকে কদাপি তা আজ পর্য্যন্ত দেয়নি। কিন্তু এই সমস্ত সুবিধা এবং অধিকার ভোগ করেও অনেক ভারতবাসী মুসলমানযুগের তুলনায় বৃটিশের অধীনে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটেছে বলে ঘোষণা করে থাকে। এদেশীয় ঐতিহাসিকদের রচনাগুলি পাঠ করলে তাদের এই দেশভক্তি অনেক পরিমাণে লাঘব হ'বে।) এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা স্বভাবতঃই দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ভারতবর্ষের মাটিতে হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার কেবলমাত্র সংঘর্ষ ও বিরোধই ঘটেছিল—কোনও প্রকার সমন্বয় ঘটেনি, কেননা, সত্যনির্ণয় অপেক্ষা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের

১। HIstory of India as told by its own Historians—in 8 Volumes-Introduction.

বনিয়াদকে পাকা করবার প্রচেষ্টার প্রতি তাঁদের লক্ষ্য ছিল অধিক। কিন্তু আমরা দেখেছি হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার পরস্পরের সংস্পর্শে আসবার পূর্ব্বেকার ইতিহাস, তাদের সমন্বয়-প্রবণতার সাক্ষ্যই দেয়। ভারতবর্ষে পরস্পরের সম্মুখীন হ'য়েও—তারা যে পথভ্রষ্ট হয়নি, প্রাথমিক সংঘর্ষের পর তারা যে পরস্পরের মিলনের পন্থা ও ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিল, এখানে সংক্ষেপে তার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করব।

যে কথা আগে একবার বলেছি তার সংক্ষেপে পুনরুক্তি করে এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করি। ভারতে ইসলামের আগমন একটি নূতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আগমন, নৃতত্ত্ব-সম্মত বিশেষ কোনও নূতন জাতির আগমন নয়। ভারতীয় জনসাধারণের যে নৃতাত্ত্বিক বিভাগের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছে তা হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য—ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সেই বিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। পৃথিবীর অন্যান্য অধিকাংশ উন্নত ধর্ম্মের ন্যায়, ইসলামের প্রচার অনেক ক্ষেত্রেই হ'য়েছিল তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে,—প্রথমত: বাণিজ্য, দ্বিতীয়তঃ প্রচারকদের উদ্যম, তৃতীয়তঃ সশস্ত্র অভিযান।[১] ভারতের সঙ্গে ইসলামীয় জগতের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্যণীয় যোগাযোগ ঘটে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরব বণিকদের মধ্যমে। ভারতে মুসলিম শক্তির সশস্ত্র অভিযান আরম্ভ হ'বার পূর্ব্বেই এরা দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে এবং এইভাবে ভারতবর্ষ মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। সমসাময়িক দাক্ষিণাত্য-রাজগণ এদের প্রতি উদার দাক্ষিণ্যই প্রদর্শন করেছিলেন। সমাগত মুসলিম বণিকগণ বাণিজ্যসূত্রে ভারতে আগমন করলেও শীঘ্রই স্থানীয় অধিবাসিদের সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে মিলতে সক্ষম হয়েছিল ; ফলে আরব ও তামিলভাষী ভারতীয়দের সংমিশ্রনে

১। T. W. Arnold প্রণীত The Preaching of Islam গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রবুত্তন, লাব্বে প্রভৃতি মিশ্রসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।[১] সমসাময়িক দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতিতেও ক্রমশঃ নবাগত মুসলমানগণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়। হিন্দু পাণ্ড্যরাজ্যের মন্ত্রী ও পরামর্শ-দাতা হিসাবে তকিউদ্দিন, সিরাজউদ্দিন ও নিজামুদ্দিনের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এমন কি কুবলাই খাঁর নিকট পাণ্ড্যরাজ্যের দূত হিসাবেও এসেছিলেন ফখরুদ্দিন আহ্‌মেদ নামক জনৈক মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারী।[২] দাক্ষিণাত্যের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের যদিও শেষ পর্য্যন্ত সমসাময়িক মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে পতন হয়—তবুও দেখা যায় তার গৌরবের যুগে পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান রাজ্যগুলির অনেকগুলির সঙ্গে—এমনকি সুদূর পারস্যের সঙ্গে পর্য্যন্ত—তার মিত্রতার সম্পর্ক ছিল।[৩] বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার সূত্রেও দক্ষিণ ভারতে ইসলামের বনিয়াদ ক্রমশঃ পাকা হ'য়ে উঠছিল। ভারতের ইসলামধর্ম্ম প্রচার সম্পর্কে আমরা পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। বর্ত্তমানে মোটামুটি একথা মনে রাখলেই হ'বে যে বাণিজ্য ও ধর্ম্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা ক্রমশঃ ভারতের মাটির সঙ্গে আপনাদের অভিন্নত্ব অনুভব কর'তে এবং ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে অনুভব করতে শিখল। উত্তর-ভারতে ইসলামের অভিযানের ফলে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই মুসলমান সম্প্রদায় দক্ষিণ-ভারতে এতই দৃঢ় এবং দেশের মাটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে উত্তর-ভারত থেকে দিল্লীর মুসলমান খিলজী সুলতান আলাউদ্দীনের সেনাপতি

১। Asoka Mehta and Achyut Pattawardhan—The Communal Triangle in India p. 11

২। Ibid.

৩। Sewell—A Forgotten Empire দ্রষ্টব্য।

মালিক কাফুর যখন দাক্ষিণাত্য জয়ের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অভিযান করেন তখন দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানেরা একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। মালিক কাফুরের বিরুদ্ধে হয়সালরাজ বীর বল্লাল যে যুদ্ধ করেন, তা'তে তাঁর সৈন্যদলে ২০,০০০ মুসলমান সৈনিক ছিল।[১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতে মুসলিম বিজয় আরম্ভ হ'বার কিছু পূর্ব্বেই ভারতেরই একাংশে ইসলাম গভীরভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ভারতবর্ষকে নিজের দেশ হিসাবে গ্রহণ করবার মত একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অর্জ্জন করবার দিকে অনেকখানি এগিয়েছে।

ভারতে সশস্ত্র মুসলিম অভিযানের এবং অবশেষে মুসলিম সাম্রাজ্য-স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, তার সবখানিই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পূর্ণ নয়। একথা অবশ্য সত্য যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরব, আফগান ও তুর্কীগণ যখন ভারত আক্রমণ করে তখন ভারত-বর্ষের বিভিন্ন হিন্দু নরপতি তাদের বাধা দিয়েছিলেন। সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার করতে হ'বে যে ধর্ম্মান্ধতা ও ধর্ম্মোন্মাদনা নবাগত মুসলিম বিজেতাদের হিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মঠমন্দিরাদির উপর সময়ে সময়ে নিদারুণ অত্যাচার করতে প্রণোদিত ক'রেছিল। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। বিজেতা ও বিজিতের সংগ্রাম অনেকস্থলে ছিল হিন্দু ও মুসলমান রাজবংশের মধ্যে বিরোধ—সাধারণ মানুষের স্তরে হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ নয়। একটু ঘুরিয়ে বলা চলে মুসলমান যুগের যুদ্ধবিগ্রহাদি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মযুদ্ধ নয়। অনেক সময়ে আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সব ঘটনা উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়, অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সে সবের গভীর

১। S. Krishnaswami Aiyangar—South India and her Mohammadan Invaders pp. 72-73

অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে। সুলতান মাহ্‌মুদ প্রভৃতি আক্রমণকারিদের হিন্দু মন্দির প্রভৃতি কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংসের তীব্র নিন্দা ঐতিহাসিকগণ, এমন কি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পর্য্যন্ত, করেছেন।[১] কিন্তু একথাও মনে রাখতে হ'বে সেযুগে প্রসিদ্ধ হিন্দুমন্দিরগুলি প্রায়ই ছিল প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের আকর এবং ধর্ম্মান্ধতার সঙ্গে সঙ্গে এই ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের লোভেই বিদেশী অভিযানকারী বার বার আকৃষ্ট হ'ত। মাহ্‌মুদের মত মন্দিরলুণ্ঠনকারী সম্রাটের তিলক নামধারী জনৈক হিন্দু সেনাপতি ছিল এবং তার স্বধর্ম্মাচরণের কোনও ব্যাঘাত কোনও দিন ঘটেনি। এর থেকে প্রমাণ হয় হিন্দু কীর্ত্তিকলাপের উপর মুসলমান আক্রমণকারিদের সাম্প্রদায়িক ছাড়াও অন্য কারণ ছিল। ভারতে মুসলমান সম্রাট ও শাসকদের তালিকা খুঁজে দেখলে বহু নাম পাওয়া যাবে, যারা রাষ্ট্রশাসনে ও পরিচালনে সাম্প্রদায়িক নীতি সম্পূর্ণ বর্জ্জন করেছিলেন। ভারতে আরব অভিযানের সময় আরব শাসকগণ হিন্দু রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক রাখতে দ্বিধা করেননি। মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দু হয়সালরাজ বীরবল্লাল সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান সেনাদল নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হয়েছে। উত্তর ভারতে যখন মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখনও সেই সাম্রাজ্য ও তদধীন প্রদেশগুলির শাসনে মুসলমান সম্রাটগণ অনেক ক্ষেত্রেই সর্ব্বাংশে সাম্প্রাদায়িক নীতি গ্রহণ করেননি। বিজয়নগর সাম্রাজ্য এবং তার সমসাময়িক পার্শ্ববর্ত্তী মুসলিম রাজ্যগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ব্বে কতকটা ইঙ্গিত দিয়েছি। এদের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লেও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তারই মধ্যে মুসলিম সুলতানেরা হিন্দু সৈন্যসামন্তাদি তাঁদের সেনাদলে রেখেছিলেন

১। Habib—Sultan Mahmud of Ghazni p. 79

এবং বিজয়নগর রাজগণ একই পথ অবলম্বন করে নিজেদের সৈন্যদলে মুসলমান নিয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। একথাও উল্লেখযোগ্য যে মুসলমান সুলতানের অধীনে হিন্দুসৈন্য এবং হিন্দু রাজাদের অধীনস্থ মুসলমান সৈন্যদের ধর্ম্মাচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।[১] মোগল রাজশক্তির সঙ্গে আজীবন যুদ্ধে অতিবাহিত করলেও মারাঠা রাজ শিবাজীর বিরাট নৌবহরের অধিকাংশ নৌসেনাপতি ছিলেন মুসলমান। সিদ্দি সম্বল, সিদ্দি মিস্ত্রি, ইব্রাহিম খাঁ, দৌলত খাঁ প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষের নাম মারাঠা জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[২] মুঘল সম্রাটদের সেনাবাহিনীতে হিন্দুসেনানায়ক যে নিযুক্ত হ'তেন একথাতো সর্ব্বসুবিদিত। মুঘল সৈন্যদলেও অমুসলমান ও হিন্দু সৈনিক নিয়োগের প্রথা ছিল। বিশেষতঃ এ'ক্ষেত্রে রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যনিয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৩] সৈন্যবিভাগ ছাড়াও শাসনতন্ত্রের অন্যান্য বিভাগে মুসলমান আমলে হিন্দুনিয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান সম্রাট ও শাসকদের শাসননীতি এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের অধিকাংশই পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণ করেন নি। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ে বাঙ্গলা দেশের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাহের কথা (১৪৯৩–১৫১৯)। এঁর কর্ম্মচারীদের মধ্যে বহু উচ্চপদস্থ হিন্দুর নাম পাওয়া যায়। বহু হিন্দু জ্ঞানী, গুণী, সাহিত্যিক এঁর বৃত্তি ভোগ করতেন। শাসনব্যাপারে যে হিন্দুমুসলমানে ভেদাভেদ নীতি হিসাবে মেনে নেওয়া একান্ত মূর্খতা—

১। Tarachand—Influence of Islam on Indian Culture p. 250

২। Surendra nath sen—The Military System of the Marathas pp 181-82

৩। Moreland—India at the Death of Akbar pp 69-70, 76 etc.

এ সত্য তিনি বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করেছিলেন।[১] কাশ্মীরের স্থলতান জয়নুল আবেদীনের নাম (১৪২০—১৪৭০) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে রাজ্য শাসন, জিজিয়া কর উচ্ছেদ, হিন্দু সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁকে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে তাঁর প্রজাদের কাছে প্রিয় করেছিল এবং কাশ্মীরের ইতিহাসে এই কারণেই তাঁর শাসনসময় একটি গৌরবময় যুগ।[২] ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে দিল্লী স্থলতানদের শাসনকালেও সর্ব্বদা সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করা হ'ত না। স্থলতান সিকন্দর লোদী থানেশ্বরের সুবিখ্যাত হিন্দু মেলাটি উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করলে তাঁর সভার জনৈক মুসলিম শাস্ত্রবিদ্ তাঁকে সেইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রদর্শন না করতে উপদেশ দেন এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থলতান সেই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ইবন বতুতা ও বারাণির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তুঘলক বংশীয় স্থলতানদের সময় হিন্দু ও মুসলিম ধনিক ও ভূস্বামীদের সমাজে একই স্থান ছিল, এবং আমরা এই সব ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে এ আভাসও পাই যে ক্রমশঃ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভাগের জায়গায় ভূস্বামী ও কৃষক এই অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ প্রবর্ত্তিত হচ্ছিল।[৩] সম্রাট শেরসাহের শাসন নীতিতেও আমরা এই একই উদারতার পরিচয় পাই। রাজ্যশাসনে ধর্ম্মগত কোনও ভেদের প্রশ্রয় তিনি কখনও দেননি। তাঁর জীবনচরিতকার যথার্থ

১। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৪৪-৪৫, ২৬২-৬৪

২। Cambridge History of India Vol III p 281

৩। Proceedings of the Indian History Congress (Third session—Calcutta 1939) pp 721-22

বলেছেন—"Neither the zeal of his bigoted admirers nor the envy of the unsympathetic detractor could set the destruction of a simple temple or image against the name of Sher Shah......Sher Shah's attitude towards Hinduism was not contemptuous sufferance but respectful deference. It received the recognition of the state."[১] (ভাবার্থঃ শেরশাহের গোঁড়া সমর্থক বা বিরোধী সমালোচক,—কেউই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মন্দির বা মূর্ত্তি ধ্বংসের অপবাদ দিতে পারেনি।......হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁর মনোভাব ঘৃণাজাত অবহেলা কদাপি ছিল না—একে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখেই দেখতেন এবং এই ধর্ম্ম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছিল।) মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও দেখা যায় যে মুঘল শাসননীতি আরম্ভ থেকে সর্ব্বদা সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে চলেনি। মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর হিন্দুরাজা রাণা সঙ্গের আহ্বানে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁকে পরাজিত করতে দ্বিধা করেননি।[২] সেখানে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর বাবরের কূট সাম্রাজ্যবাদী নীতি জয়ী হয়েছে। মুসলমান সম্রাট শেরসাহের সঙ্গে মুঘলবাদশাহ হুমায়ুনের যুদ্ধ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আবার এই হুমায়ুনই তাঁর সমসাময়িক জনৈকা রাজপুত রাণীর সঙ্গে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর পক্ষাবলম্বন করতে দ্বিধা করেন নি। এই সব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় বাবর, হুমায়ুন প্রভৃতি শাসকগণ সর্ব্বদা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের খাতিরে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতেন না এবং তাঁদের সময়কার যুদ্ধবিগ্রহ অনেক সময়েই দুই সম্প্রদায়ের

১। K. R. Quanungo—Sher Shah (Calcutta 1921) p. 417

২। Memoirs of Babar (translated by Leyden & Erskin) Vol II p. 254

লড়াই ছিল না। এই অসাম্প্রদায়িক নীতির পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই পরবর্ত্তী সম্রাট মুঘলযুগের শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আকবরের শাসনকালে। আকবরের ধর্ম্মমতের কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব, কিন্তু শাসননীতির দিক থেকেও তাঁর অবলম্বিত পন্থা উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। "ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ" এই জাতীয়তাবাদী নীতি মুঘল-বাদশাহগণের মধ্যে আকবরই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। এই উদারনীতির কাছে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদের স্থান ছিল না। রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর পদ থেকে সুরু করে সর্ব্বনিম্ন সৈনিকের পদে পর্য্যন্ত মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু সমানভাবে নিযুক্ত হ'ত। এমন কি বিবাহ ব্যাপারে পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করে আকবর নিজ বংশে হিন্দু-মুসলমান মিলিতরক্তের প্রবর্ত্তন করেন।[১] এই হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ-প্রথা আকবরের সময় থেকে মুঘল রাজবংশে প্রচলিত হয় এবং তাঁর পরবর্ত্তীগণ অনেকে এই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে পশ্চাৎপদ হন নি। আকবরই মুঘলসম্রাটগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী হয়ে সাম্প্রদায়িক জিজিয়া করপ্রথা তুলে দেন এবং জাহাঙ্গীর ও সাহ্‌জাহান তা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেননি। রাজ্যশাসনে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা ফিরিয়ে এনেছিলেন আওরংজেব—তাঁর আমলেই জিজিয়া কর আবার অমুসলমানদের উপর ধার্য্য করা হয়। কিন্তু মুঘল-সম্রাটদের মধ্যে সর্ব্বাধিক সঙ্কীর্ণমনা ও গোঁড়া হ'লেও আওরংজেবের শাসননীতিকে সর্ব্বাংশে সাম্প্রদায়িক বলতে আমাদের বাধে—যখন দেখি তিনি উমানন্দের হিন্দুমন্দিরে জমি দান করছেন, স্বধর্ম্মাবলম্বী শিয়া সম্প্রদায়কেও নিজের বিরুদ্ধাচরণের দ্বারা বিমুখ করে তুলছেন,[২]

১। ব্যক্তিগত জীবনে আকবর ছিলেন সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে; দ্রষ্টব্য Smith—Akbar—The Great Mogul pp. 333 ff.

২। শিয়া বিরোধী মুঘল শাসননীতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—Irvine—Later Mughals Vol II pp 310-11

এবং সাম্রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিরোধী হিন্দুশক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী মুসলমান রাজ্যগুলিকেও অকুন্ঠিত চিত্তে আক্রমণ করে ধ্বংস করছেন।

এতক্ষণ মুসলমান যুগের সাম্রাজ্যশাসন নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তা যে সর্ব্বদা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পরিচালিত হ'ত না—একথা আভাষে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। মুসলমান যুগের সুলতান ও বাদশাহ্‌দের সৈন্যবিভাগ সম্পর্কে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এক্ষেত্রে লোক নিয়োগের ভিত্তিও সর্ব্বাংশে সাম্প্রদায়িক ছিল না। সুলতান মাহ্‌মুদের সময় থেকে মুসলমান শাসকগণ হিন্দু সেনাধ্যক্ষ ও হিন্দু সৈনিক নিয়োগ করে এসেছেন। আওরংজেবের সময় পর্য্যন্ত সামরিক ও অন্যান্য বিভাগে হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়ে এসেছে। আওরংজেব কতকটা ধর্ম্মান্ধতার বশবর্ত্তী হয়ে কেবলমাত্র মুসলমান কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসনকার্য্য চালাবার একটা প্রচেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাতে শাসনকার্য্যের অসুবিধা হওয়ায় তিনি এই সাম্প্রদায়িক নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেই যুগের ক্ষমতাশালী হিন্দুরাজা ও শাসকগণও প্রয়োজনমত মুসলমান রাজকর্ম্মচারী সৈন্যাধ্যক্ষ ও সাধারণ সৈন্য নিয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। আলোচ্য যুগের শাসননীতির আরও একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি—এক কথায় রাষ্ট্রবিস্তার ও ব্যক্তিগতভাবে শাসকের ক্ষমতাবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও রকম সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বা ওজর আপত্তি টিকতে পারতনা। ফলে দেখা যায় হিন্দু রাজার সঙ্গে মুসলমান সুলতানের যুদ্ধের পাশাপাশি একাধিক মুসলমান শাসকের মধ্যে সংঘর্ষ, আবার সুবিধামত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাসকদের মধ্যে সন্ধি ও মৈত্রী। এতদ্ব্যতীত একই সম্প্রদায়ের একাধিক শাখার মধ্যে বিরোধের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সুতরাং ভারতে মুসলমান শাসনের

যুগকে মূলতঃ হিন্দুমুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও কলহের যুগ বলে বর্ণনা করলে সর্ব্বাংশে সত্য কথা বলা হবে না।

মুসলমান শাসনকালে ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায় যে ধর্ম্মগত বিভেদের উপর সমাজব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছুরই ভিত্তি ছিলনা। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরা বিদেশ থেকে বিজয়ী হিসাবে ভারতে প্রথম প্রবেশ করে একথা অবশ্য সত্য। ভারতবর্ষ অধিকার করবার পর বিজয়ীরা ভারতে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ ভারত-বর্ষকে তারা নিজেদের দেশ হিসাবে গ্রহণ করতে শেখে। সশস্ত্র অভিযান ও ধর্ম্মপ্রচারের ফলে দলে দলে ভারতবাসী ইসলাম গ্রহণ করে এবং বিদেশী মুসলমান যারা এই দেশে বসবাস আরম্ভ করেছিল তারা অনেকেই এদেশে বিবাহ করে দেশের মাটির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে। এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতীয় মুসলমানের সমাজদেহটি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে অধিকাংশই হ'ল ভারতবাসী—যারা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিল—এবং অবশিষ্ট, তুলনায় মুষ্টিমেয়, বিদেশী যাদের অধিকাংশই ভারতকে ক্রমশঃ স্বদেশ ভাবতে শিখছিল। এই ব্যবস্থা চরম রূপ পেল মুঘলসম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যখন আকবর তাঁর সুবিখ্যাত "ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ" নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে অধিকসংখ্যক বিদেশী মুসলমানের (যারা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অনবরতঃ ভারতে আসা যাওয়া করত) ভারতে আসবার আর বিশেষ সুবিধা বা আকর্ষণ রইলনা। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ তাই রক্তে, সংস্কৃতিতে ধীরে ধীরে নিখিল ভারতীয় সমাজদেহের একটি বিশিষ্ট অঙ্গে পরিণত হল। ভারতীয় মুসলমান সমাজের এই বিচিত্র পরিণতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে। মুসলমান যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের

পর্য্যালোচনাতেও এই একই সত্য ধরা পড়ে যে এযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আর যাই হোক সাম্প্রদায়িক বিভেদের স্থান ছিল না। একথা সত্য যে বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ভারতের জনসাধারণকে যে অর্থনৈতিক শোষণ সহ্য করতে হয় মুসলমান শাসনকালে এই শোষণের কোনও ব্যতিক্রম ছিলনা, প্রাক্-মুসলমান যুগের ভারতবর্ষেও নয়। এ ব্যাপারে প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতে কোনও তফাৎ নেই, কেননা সাম্রাজ্যবাদের আকৃতি যুগে যুগে বদলালেও প্রকৃতি চিরকালই এক। মুঘলযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড। তাঁর আলোচনা থেকে জানতে পারা যায় যে সম্রাট ও তাঁর অধীনস্থ ভূস্বামী রাজা, নবাব ও আমীরদের নিয়ে যে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তার চাপে জনসাধারণের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। বাদশা, রাজা, জমিদারদের বিলাসিতা এবং অত্যাচারে শিল্পী ও শ্রমিকগোষ্ঠী এবং সাধারণ কৃষকগণের স্বচ্ছলভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করাই দুরূহ হয়ে পড়েছিল। রাজধানীর জাঁকজমক ও বিলাসের পিছনে লুকিয়েছিল সর্ব্বসাধারণের অভাব, দুর্দ্দশা, অর্দ্ধাশন ও অনশন। আমলাতন্ত্রের অবিরত শোষণের ফলে দেশের জনসাধারণের এই শোচনীয় অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন মোরল্যাণ্ড, তাঁর গ্রন্থগুলিতে।[১] লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে উক্ত শোষণব্যবস্থা কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই রেহাই দিত না—শোষিত জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুমুসলমান সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকই ছিল এবং উৎপীড়ন সকলের উপরই হত। আবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারী ও শোষক ভূস্বামী ও রাজপুরুষদের মধ্যেও হিন্দুমুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থ কি ভাবে

১। Moreland—India at the Death of Akbar pp 137-38, 265-70; From Akbar to Aurangzeb pp 304-05

সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির উপর প্রাধান্যলাভ করত তার একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় আওরংজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস থেকে। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে আওরংজেব যখন হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেবলমাত্র মুসলমানদের বাণিজ্যকর মাফ করবার আদেশ দেন, তখন হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা এই ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে একজোট হন এবং মুসলমানদের সম্মতি অনুযায়ী হিন্দু বণিকগণ বাণিজ্যকর থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তাদের নিজেদের বাণিজ্যদ্রব্য মুসলমানদের সম্পত্তি বলে প্রচার করতে দ্বিধা করেন নি।[১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতে মুসলিম শাসনের যুগে দিল্লীর সাম্রাজ্যনীতির ভিত্তি আর যাই হোক সর্ব্বাংশে সাম্প্রদায়িক ছিল না। ধর্ম্মের ব্যাপারে মুসলমান শাসকগণের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্য্যকলাপ বর্ত্তমান যুগের দৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণ মনে হ'লেও, সমসাময়িক ইউরোপের মত মূঢ় ধর্ম্মান্ধতা যে তাকে অধিকার করতে পারে নি, এটা কম কথা নয়। অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেও শ্রেণী-স্বার্থ এবং সংমিশ্রণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং সাম্প্রদায়িক বিভাগের স্থান ধীরে ধীরে গ্রহণ করছিল।

তাহলে মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে এই যে ভারতের প্রাক্‌মুসলমান যুগের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে নানা বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি থেকে উদার ভাবে আহরণ করে নিজেকে পুষ্ট করেছে, এবং সে সংস্কৃতির মূল মন্ত্রই হচ্ছে সংমিশ্রণ ও সমন্বয়; আবার মুসলমান সভ্যতার প্রাথমিক আলোচনাতে একথাই স্পষ্ট হয় যে মুসলিম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিও চিরকাল আদানপ্রদান ও সমন্বয়ের পথেই অগ্রসর হয়েছে। এই দুই বিরাট সভ্যতা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল এবং পাশাপাশি বাস করতে

১। Jadu Nath Sarkar—History of Aurangzeb vol III (1921) pp 275-76

থাকল, পরস্পরকে চিনবার জানবার এবং গ্রহণ করবার সুযোগও তারা পুর্ণমাত্রাতেই পেল। মিলনের পথ আরও সুগম করে দিয়েছিল মুসলমান ভারতের কতকটা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রবিন্যাস এবং ভারতীয় হিন্দুসমাজ থেকে নবদীক্ষিত মুসলমানদ্বারা গঠিত ভারতীয় মুসলমান সমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় মুসলমান সমাজের শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমানই ভারতীয় হওয়াতে প্রাক্‌মুসলমান যুগের লক্ষ্যণীয় ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ আগের মতই থেকে গেল। সেই সঙ্গে তারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে আস্বাদ পেল মুসলিম সংস্কৃতির। যে সকল ভারতবাসী ধর্ম্মহিসাবে ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও দৈনন্দিন জীবনে এর গভীর প্রভাবকে এড়াতে পারল না। সুতরাং সকল দিক দিয়ে সংস্কৃতি-সম্মিলনের পথ ক্রমশঃ সুগম হয়ে উঠতে লাগলো। এখন এই মিলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে ইসলাম সর্ব্বতোভাবে একটি প্রগতিশীল ধর্ম্ম এবং কোর-আন ও হাদিস আশ্রয়ী ইসলাম ধর্ম্মের যে প্রাথমিক শরিয়তী রূপ তা বরাবর আপনার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাইরের নানা প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিল। এই কারণে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাব পড়ায় তা যেমন গভীরভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল তেমনি হিন্দু ও বৌদ্ধ জীবনাদর্শের প্রভাব ভারতে ও ভারতের বাইরে ইসলামের উপর বিস্তারিত হওয়ায় ইসলামের কতগুলি সময়োপযোগী বিকাশ ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান হল দার্শনিক সূফী মতবাদের উদ্ভব। এই সূফী মতবাদ যে মূলতঃ ইসলাম ধর্ম্মের থেকে পৃথক কিছু নয় আবদুল্লা, আল তুস্তারী, জুনাইদ, আবু বকর্, আল কালাবধী, হুজয়িরি, আল গাজালী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মুসলমান দার্শনিক ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ—তা

স্পষ্ট করে বলে গিয়েছেন। তথাপি সূফী মতবাদের কতগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যা উল্লেখযোগ্য।[১] (১) ঈশ্বর এই জগৎচরাচর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন নন; তিনি জগল্লীন ও বিশ্বাত্মা। (২) ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর এবং একমাত্র তত্ত্ব—জগৎ তাঁর অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, তিনি ভিন্ন তা অন্য কোনও তত্ত্ব নয়। অর্থাৎ সূফীদর্শনে একেশ্বরবাদ বা monotheism কে ছাড়িয়ে গিয়ে একতত্ত্ববাদ বা monismএর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। (৩) ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ তার সঙ্গে উপাসকের সম্পর্ক প্রীতির, ভয়ের নয়। (৪) প্রত্যেক ধর্ম্মে কিছু না কিছু সত্যের ভাগ আছে যা প্রকৃত মুসলমানের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (৫) উপাসক সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও বাণী লাভ করতে পারেন। (৬) সন্ন্যাসগ্রহণ ও চিরকৌমার্য্য পালন প্রশংসনীয়। (৭) গুরুবাদ, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতির প্রাধান্য। (৮) কর্ম্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-প্রবণতার উপর ঝোঁক। (৯) বাহ্যিক আচার-পরায়ণতার প্রতি অবজ্ঞা। (১০) অবতারবাদের প্রতি সময় সময় অনুকূল মনোভাব। (১১) আত্মার নিত্যতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে তার লয়তত্ত্ব। (১২) ভাবাবেগ, উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস, সমাধি প্রভৃতি সাধকোচিত অবস্থার সপ্রশংস স্বীকৃতি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে শরিয়তী ইসলাম ধর্ম্মের সুকঠোর ক্রিয়াশীল দ্বৈতবাদের স্থলে সূফীদর্শনে এক অদ্বৈতপন্থী প্রেমমূলক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশীল দার্শনিক মতবাদের অবতারণা করা হয়েছে। ইসলামের মূলনীতিগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেও সূফীগণ দার্শনিক বিচার ও ধর্ম্মসাধনার পথে আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠতম কবি সাহিত্যিক দার্শনিকদের অনেকেই এই সূফীমতাবলম্বী ছিলেন। সূফীদর্শনের উদ্ভবের মূলে ইসলামের নিজস্ব গ্রহণশীল প্রতিভাতো ছিলই কিন্তু বর্ত্তমানে একথাও পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে হিন্দু (বৈদা-

১। ডক্টর রমা চৌধুরী—বেদান্ত ও সূফী দর্শন পৃঃ ১৩-১৫, ১৫৭-৬১

ন্তিক ও বৈষ্ণব) এবং বৌদ্ধ চিন্তাধারার প্রভাব এর পিছনে গভীর ভাবে কাজ করেছে।

উপরে স্থফী দর্শনের যে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হ'য়েছে তার মধ্যে বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব ভাবধারার ছাপ খুব স্পষ্ট। স্থবিখ্যাত মুসলমান স্থফী কবি রুমী, হাফেজ প্রভৃতির সঙ্গে বৈষ্ণবকাব্যের ভাবগত ঐক্য দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন যা উপরিউক্ত স্থফী কবিদের শেষ কথা—সেটির জন্য তারা ভারতের কাছে ঋণী একথা পণ্ডিতমহলে আজ স্বীকৃত।[১] ভারতের মাটিতে ইসলামের প্রথম প্রচারের যুগে প্রচারক ও শাসক-শ্রেণী মারফৎ সনাতন শরিয়তী ধর্ম্মই প্রথম প্রচারিত হয় বটে; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়ে জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা প্রধানতঃ এই স্থফী ধর্ম্মমত। সংস্কৃতিবান ভারতীয় হিন্দুগণের ইসলাম গ্রহণের সময় স্থফী মতবাদকেই অনেকাংশে অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক।[২] সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন কৃষ্টির নানা প্রভাব ইসলাম ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সমাজ ব্যবস্থার উপর পড়ে এবং ভারতীয় মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। এই ভাবে ক্রমশঃ ভারতীয় ইসলামের জন্ম হয়। "ভারতীয় ইসলাম" ভারতবর্ষেরই নিজস্ব সম্পদ; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইসলামী সভ্যতার এর উপর ধর্ম্মগত মূলনীতিগুলি ছাড়া আর কোনও প্রভাব নেই। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।[৩] বাংলা দেশের ওলা বিবি,

---

১। Nicholson—Mystics of Islam p 17

২। উদাহরণস্বরূপ বাঙ্গালাদেশে স্থফী ধর্ম্মের বিস্তার ও প্রভাব সম্পর্কে এনামুল হক্ প্রণীত "বঙ্গে স্থফী প্রভাব" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩। এই প্রসঙ্গ লিখতে সুপরিচিত সমাজতাত্ত্বিক ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের রচনা থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

বনাৰ্বাব প্রভৃতি দেবতা বাঙালী মুসলমানেরই দেবতা, এর পুজাও মুসলমানেরাই করে থাকেন। মূল ইসলাম ধর্ম্মে এরা অজ্ঞাত। মুসলমান সমাজে বহু পীর আছেন যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের দ্বারাই পুজিত হন এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁদের শিষ্য আছেন। মূল ইসলামের সঙ্গে এঁদেরও সম্পর্ক ক্ষীণ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাঙ্গালার সুলতান হুসেন শাহের কথা; ইনি সর্ব্বপ্রথমে সত্যপীর নামক এক নূতন দেবতার পূজা প্রবর্ত্তন করেন—যে দেবতা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূজ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই দেবতা সুপরিচিত। শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র পীরদের মধ্যে জনকতকের নাম—গুগা পীর, লালবেগ, পঞ্চপীর ইত্যাদি। পশ্চিম ভারতের বোরা ও খোজা সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা ইসমায়েলী নামক সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা বহু পরিমাণে হিন্দু ধর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপোষ করেছেন। এঁরা হিন্দুদের মতই অবতারবাদে বিশ্বাস করেন এবং এঁদের একজন বড় প্রচারকের মতে আলি প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের দশম অবতার। এই মুসলমানযুগেই রচিত হয় বিচিত্র "আল্লোপনিষদ" যা কোনও কোনও মৌলবী পর্য্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করে থাকেন। উপনিষদের মত সংস্কৃতে শ্লোকাকারে লেখা হলেও এটিতে আল্লার মহিমা ঘোষণা করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে হিন্দুদের মধ্যে অভিনব উপায়ে ইসলাম ধর্ম্মপ্রচার করবার উদ্দেশ্যেই এটি রচিত হয়েছিল। "নাগোসি" বলে ভারতীয় মুসলমানদের একটি সম্প্রদায় ঠিক হিন্দু বৈষ্ণবদের মতই মাংসাহার করাকে পাপ বলে মনে করেন।[১] বোম্বাই প্রদেশের খোজা ও কচ্ছিমেমন, কাথিওয়াড়ের হালওয়াইমেমন, গুজরাটের বোরা, রাজপুতানার গিরসিয়া, প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দ্বারা পরিচালিত হ'ন। অনর্থক উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই,—দেখা যাচ্ছে দেশ-

---

১। Titus—Indian Islam p 99 (ডাঃ দত্ত কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)

কালের বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী ইসলাম ভারতের মাটিতে জনসাধারণের মধ্যে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে। সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সংযোগ ও সমন্বয় কি রূপ ধারণ করেছিল আমরা যথাস্থানে সে আলোচনা করব। এখানে বক্তব্য এই, শাসকদের দরবারে ইসলামের যে শরিয়তী রূপ আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ইসলামের রূপটি ঠিক সেইরূপ ছিল না। হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুমানসের সঙ্গে যোগাযোগই এই রূপান্তরের হেতু এতে সন্দেহ নেই। জনসাধারণের মধ্যে যে আলোড়ন, পরিবর্ত্তন ও সমন্বয় দেখতে পাই, তার ঢেউ রাজদরবারকেও যে স্পর্শ করেছিল তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ সম্রাট আকবর। আকবরের নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম "দীন্ ইলাহি" সর্ব্বাংশে সফল ও সার্থক না হ'লেও সেটা সে তাঁর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের ও হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটানোর একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা—একথা মানতেই হবে। জনৈক আধুনিক ঐতিহাসিক যথার্থই বলেছেন—The Din-i-Ilahi of Emperor Akbar, clearly demonstrated how the Central Asian forces wending their course, through the semiticism of Arabia and filtering through monism of Iran, were ultmiately Aryanised by the touch of Hinduism."[১] (ভাবার্থঃ সম্রাট আকবরের প্রচারিত দীন ইলাহি ধর্ম্ম, মধ্য এসিয়ার চিন্তাধারা, আরবের সেমিটিক দৃষ্টিভঙ্গী, পারস্যের দার্শনিক একতত্ত্ববাদ এবং হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।) এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ নাম করতে হয় সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সাধক দারা সুকোর। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁর

১। M. L. Roychowdhuri—Din-i-Ilahi or The Religion of Akbar pp. XXIII, 121 ff

ছিল অসামান্য অধিকার এবং হিন্দু ও সুফীদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি পার্সী ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; তার নাম "মাজমুয়া-উল বহারিণ" বা "দুই সাগরের সঙ্গম"। "সির-উল-অস্রার" নামক তাঁর উপনিষদের পার্সী অনুবাদও বিখ্যাত। হিন্দু-মুসলিম ধর্ম্মসমন্বয়ের স্বপ্ন দেখে তিনি জীবন কাটিয়ে গিয়েছিলেন এবং এবিষয়ে তাঁর প্রথমোক্ত গ্রন্থ যিনি পাঠ করেছেন তাঁর আন্তরিকতায় তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। আত্মা, জ্যোতি, নাম প্রভৃতি বিষয়ে এই গ্রন্থস্থ তুলনামূলক আলোচনা, তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হবে।[১] আকবরের আমলে দেখতে পাই কিছু কিছু হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ পার্সী ভাষায় অনূদিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে—তার মধ্যে অথর্ব্ববেদ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি প্রধান।[২] আকবর, দারাসুকো প্রভৃতির সম্পর্কে একথাও উল্লেখযোগ্য যে ধর্ম্মসাধনা ও অনুসন্ধানের পথে তাঁরা একক ছিলেন না—তাঁদের কেন্দ্র করে এক একটি নাতিবৃহৎ মণ্ডলীও গড়ে উঠেছিল। জনসাধারণের স্তরের ধর্ম্মসমন্বয় সমাজ ও রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয়দেরও যে আলোড়িত করেছিল তার প্রমাণ আমরা এর থেকে পাই। আবার আওরংজেব কর্তৃক সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে দারাসুকোর লাঞ্ছনা ও প্রাণদণ্ড দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, তা স্পষ্টই দেখিয়ে দেয় যে এই সাধক রাজপুত্র তাঁর সমন্বয়-মূলক মতামত সত্ত্বেও তাঁর সময়ে কতটা জনপ্রিয় ছিলেন।[৩]

১। Majma-ul-Bahrain (Persian Text with English translation-edited by M. M. Haq) pp 44-45, 48-50, 53-54

২। Smith—Akbar p 423

৩। Sarkar—History of Aurangzib Vol. II (1912) pp. 211-13 216-17.

এতক্ষণ হিন্দু মুসলিম উভয় সংস্কৃতির যোগাযোগের ফলে মুসলিম মানসে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার কিছু আভাষ দেওয়া হ'য়েছে। এ যোগাযোগ হিন্দুমানসে কি বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং তার ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কি রূপান্তর ঘটেছিল, বর্ত্তমানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এই প্রতিক্রিয়ার দুটি রূপ আমরা দেখতে পাই। একদল ছুঁৎমার্গ ও রক্ষণশীলতার দিকে বেশী করে ঝুঁকল। পুরাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধিনিষেধকে আঁকড়ে ধরে এবং প্রয়োজনমত নিত্য-নূতন সামাজিক আইনকানুন সৃষ্টি করে হিন্দু সমাজকে এরা বিধর্ম্মী মুসলমানের স্পর্শ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এই রক্ষণশীল দলের হিন্দুসমাজের তথাকথিত পবিত্রতা ও বিশুদ্ধিকে বজায় রাখবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা মোটেই সাফল্য লাভ করেনি। অপরদল ছিল জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে প্রগতিপন্থী। এদের বৈশিষ্ট্য এই যে এরা স্পষ্টতঃ কোথাও শাস্ত্রীয় আচারবিচারকে ভুল বা পাপ বলে উড়িয়ে দেয়নি কিংবা (দেধরাজের মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক দু'এক জন ছাড়া) প্রকাশ্যে সক্রিয়ভাবে সনাতন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেনি। তা সত্ত্বেও এরা এমন একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল, যা ধর্ম্মকে তার চিরন্তন বিধিনিষেধের ও শাস্ত্রবিচারের গণ্ডী থেকে বার করে এনে একটি অতি সহজ, সরল, হৃদয়গ্রাহী রূপ দিতে সক্ষম হ'য়েছিল। ঈশ্বরের সঙ্গে উপাসকের এমন একটি সহজ অথচ গভীর সম্পর্ক এরা কল্পনা করেছিল যেখানে বিভিন্ন জাতি, বা ধর্ম্মের সমস্ত ভেদাভেদ লুপ্ত হ'য়ে মানুষমাত্রেই দাঁড়াবার একটি সমান ভূমি পায়। মধ্যযুগের এই উদার ধর্ম্মসমন্বয়ের ভিত্তি মূলতঃ হিন্দুধর্ম্ম হলেও ইসলামের প্রভাব তার উপর গভীররূপে কার্য্যকরী হ'য়েছিল। এ' সময়কার ধর্ম্ম আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেবার স্থান আমাদের নেই; কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত

উল্লেখেই তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতের বৈষ্ণব ভক্তিআন্দোলনে যদিও প্রকাশ্য ভাবে ইসলামের প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন তথাপি একথা জোর করেই বলা যায় যে এই আন্দোলন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিধিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করেও শেষোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিত্তিকে অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছিল এবং এক্ষেত্রে ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গী তাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল কম নয়। বাঙ্গলার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের জীবনে দেখা যায় যে বাহ্যতঃ ইসলামধর্ম্মের কোনও কিছু গ্রহণ না করেও তিনি কয়েকটি মুসলমান শিষ্য লাভ করেছিলেন।[২] তাঁর প্রেমধর্ম্মের মূল ভিত্তি হিন্দুশাস্ত্রে থাকলেও তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সামনে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ বা ধর্ম্মের ভেদ ছিল না এবং সেই কারণে তা ধর্ম্মপিপাসু মুসলমানদের চিত্তে সাড়া জাগাতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সফল হ'য়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের যা শ্রেষ্ঠ উপাদান তার সমন্বয় আমরা আরও সুস্পষ্ট ভাবে ক্রমশঃ পাই—কবীর, দাদূ, রজ্জব, রবিদাস, নামদেব, তুকারাম, রামদাস, একনাথ, প্রাণনাথ, পলটু শাহ, দেধরাজ প্রভৃতি অসংখ্য সাধক ও সংস্কারকদের বাণী ও প্রচেষ্টার মধ্যে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই সব সাধক ও মরমীরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম্মের সনাতনপন্থীদের গোঁড়ামীর প্রচুর নিন্দা করেছেন এবং দুই ধর্ম্মের

১। ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্ম্মআন্দোলনগুলির স্বরূপ বিস্তারে জানতে হ'লে ক্ষিতিমোহন সেন "ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়); 'কবীর' (চার খণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর); 'দাদূ' (বিশ্বভারতী); 'বাংলার সাধনা' (বিশ্বভারতী); Carpenter—Theism in Medieval India ; মোহম্মদ মনসুরউদ্দিন—হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রভৃতি গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

২। **T. Rajagopala Chariar—The Vaisnavite Reformers of India p.p. 127-28.**

মধ্যকার সার সত্যটুকুর (যেখানে উপাসকের সঙ্গে উপাস্য দেবতার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, সহজ ও অনাবিল) উপরেই নিজেদের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবীর সম্পর্কে শ্রীযুক্তা Evelyn Underhill লিখেছেন—"Living at the moment in which the impassioned poetry and deep philosophy of the great Persian mystics, Attār, Sādi, Jalāluddin Rūmī and Hāfiz were exercising a powerful influence on the religious thought of India, he dreamed of reconciling this intense and personal Mohamedan mysticism with the traditional theology of Brahmanism."[১] (ভাবার্থঃ আত্তার, সাদি, জালালুদ্দিন রুমী, হাফেজ প্রভৃতি সুবিখ্যাত পারস্য-দেশীয় মরমীগণের কবিতা ও দার্শনিক চিন্তাধারা—ভারতবর্ষের ধর্মজগতে যখন আলোড়ন তুলেছে কবীর সেই সময়কার লোক। এবং সেই কারণেই তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলিম জগতের এই গভীর ও ভক্তিমূলক মরমীয়তাবাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সমন্বয় স্থাপন করা।) এই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের বাহ্য আচারবিচারের প্রতি এবং এইগুলিকে যারা মূলধন করে জনসাধারণকে শোষণ করত, সেই পুরোহিত ও মোল্লাদের প্রতি কবীরের ছিল অবিমিশ্র তাচ্ছিল্য! মন্দির ও মসজিদে গিয়ে নিয়মিত পূজা ও নমাজ করলেই ধর্ম্মসাধনা হয় না—কবীরের মতে, ভগবান সকল সম্প্রদায় ও বিধিনিষেধের ঊর্দ্ধে। হিন্দু ও মুসলমানের উপাস্য দেবতা একই—সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের বাহ্য আচার-আচরণ নিয়ে ঝগড়া করবার কিছু নেই—এই ছিল কবীরের মূল বক্তব্য।

১। Introduction to the Poems of Kabir (translated by Rabindra Nath Tagore) p. vii.

"রাম খুদা শিব শক্তি একৈ
কহুঁ ধৌ কোন নিহোরা
বেদ, পুরাণ, কিতেব কুরানা
নানা ভাতি বখানা।
হিংদু তুর্ক জৈনী উ যোগী
যে কল কাহু ন জানা।"

"রাম খোদা শিব শক্তি একই। তাঁর করুণা আর কত বলব। বেদ, পুরাণ, কেতাব, কোরাণ, নানা ভাবে তাঁকে ব্যাখ্যা করেছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, যোগী, কেউই এই রহস্য বোঝেন নি।" অন্যত্র তিনি নিজের উদার ও অসাম্প্রদায়িক-সমন্বয়দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন খুব স্পষ্ট করে।

"কবীর পোংগরা অলহ্ রামকা
সো গুরু পীর হামারা।"[১]

"কবীর আল্লা ও রামের পুত্র। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।"

ঠিক অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় সাধক দাদূর ভক্তি-রসাত্মক রচনায়।

"অলহ রাম ছুটা ভরম মোরা
হিংদূ তুরুক ভেদ কুছ নাহীঁ, দেখৌঁ দরশন তোরা।"[২]

"আল্লা, রাম প্রভৃতি দ্বৈতের ভ্রম আমার দূর হয়েছে, হিন্দুমুসলমান কোনও ভেদ নাই। সর্ব্বত্র দেখছি তোমার রূপ।" ঈশ্বর সকলের, তাঁর উপাসনায় কোনও জাতি বা সম্প্রদায় ভেদ থাকতে পারেনা—

১। ক্ষিতিমোহন সেন—কবীর দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১২-১৩; তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩

২। ক্ষিতিমোহন সেন—দাদূ পৃঃ ৫৯৬

মানুষে মানুষে ভেদ আমাদের মনগড়া সৃষ্টি একথাও দাদূ স্পষ্ট করে বলেছেন—

"সব ঘট একৈ আত্মা, ক্যা হিন্দু মুসলমান"

"হিন্দুই বল আর মুসলমানই বল সর্ব্বত্র সেই একই আত্মা।" ধর্ম্মে ধর্ম্মে কৃত্রিম ভেদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতলববাজ ধর্ম্মব্যবসায়ীদের সৃষ্ট বিদ্বেষ যে কতখানি অসার, তা স্পষ্ট করে বলেছেন মধ্যযুগের আর এক সাধক রজ্জব—

"রজ্জব বসুধা বেদ সব, কুল আলম কুরাণ,
পণ্ডিত কাজী বেথড়ৈ, দফতর দুনিয়া জান।
সৃষ্টি শাস্তর হৈ সহী, বেত্তা করে বাখান
রজ্জব কাগজ ক্যা পঢ়ৈ নিতহী তাজা গ্যান।"

"সমগ্র বসুধা হল বেদ, সমগ্র সৃষ্টি হল কোরাণ। কতগুলি মানুষের লেখা দফতরকে বিশ্বসংসার মনে করে, পণ্ডিত ও কাজীরা নিয়ে যান ব্যর্থতার পথে ও দুঃখ দেন। সৃষ্টি হল যথার্থ শাস্ত্র, বেত্তামাত্র এর সাক্ষী দেবেন। হে রজ্জব, বৃথা কাগজ কি পড়? বিশ্বেই তো নিত্য তাজা জ্ঞান।"[১] হিন্দু মুসলিম সনাতন শাস্ত্রপন্থীরা যে কৃত্রিম বিধি নিষেধের বাধা সৃষ্টি করে উপাস্য ও উপাসকের সহজ ও মধুর সম্পর্কের পথরোধ করেছে, একথা বাংলার বাউল সাধকেরাও বলেছেন মুক্ত কণ্ঠে—

"তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে।"[২]

এই ভাবে সনাতন শাস্ত্রীয় আচার বাদ দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানক

১। রজ্জবের মূল বাণী ও তার অনুবাদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের রচনা থেকে সংগৃহীত।

২। ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা পৃঃ ৭৮

ধর্ম্মের যা শ্রেষ্ঠ উপাদান তার সমন্বয় সাধন করে সাম্প্রদায়িক মিলনের বাণী প্রচার করেছেন—মধ্যযুগের অসংখ্য সাধকের দল। এঁদের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে এঁরা মুখে যেমন সাম্প্রদায়িক মিলনের কথা বলেছেন, নিজেদের জীবনেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন। তাই এই যুগে প্রায়ই দেখা যায়—মুসলমান সূফী সাধকের শিষ্যবর্গ হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের থেকেই আসত; আবার হিন্দু ধর্ম্মগুরুদের বেলাতেও হিন্দুমুসলমান একযোগে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করত। শেষোক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন তথাকথিত নীচকুলসম্ভূত—ব্রাহ্মণবংশে তাঁদের অনেকেই জন্মান নি। এ সম্পর্কে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে এঁরা সর্ব্বদা নিজেদের উপদেশ বা বাণী প্রচার করেছেন জনসাধারণের কথ্যভাষায়; কাজেই তা সাধারণ লোকের মর্ম্মে পৌছাতে দেরী হয় নি। তাই মধ্যযুগের ভারতবাসী জনসাধারণের ধর্ম্মমতের খোঁজ নিতে হলে এই সাধকদের ধর্ম্মমূলক রচনাবলীই আমাদের আলোচনা করতে হবে সব চেয়ে বেশী। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপর ইসলামের উদার একেশ্বরবাদ ও সমদৃষ্টির প্রভাব পড়ায় মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ধর্ম্মজগতে এই যে সমন্বয় চেষ্টা করেছিল তার চিহ্ন পরবর্ত্তী জাতীয় জাগরণগুলির মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মারাঠা ও শিখ অভ্যুত্থানের উল্লেখ করা চলতে পারে। এর প্রথমটিকে "হিন্দু জাগরণ" বলে যতই সাম্প্রদায়িক ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন, আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অনেকে মনে করেন যে মারাঠাগণ ধর্ম্মে হিন্দু হলেও শিবাজীর নেতৃত্বে তাদের জাতীয় জাগরণকে পুরোপুরি হিন্দু জাতীয় অভ্যুত্থান বলা চলে না। শিবাজী স্বয়ং সে রকম কিছু ভাবেননি বা ভাববার অবকাশ পান নি।[১] কিন্তু একথা ঠিক মারাঠা জাতীয় জাগরণের মূলে

১। Jadunath Sarkar—Sivaji and His Times (1929) p 402

ইসলামের আদর্শের প্রভাব, তথা মধ্যযুগের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্দোলনের প্রভাব গভীরভাবে কার্য্যকরী হয়েছে।[১] শিখশক্তির অভ্যুদয়ের পিছনেও আমরা অনুরূপ প্রভাবের পরিচয় পাই। গুরু নানকের উদার শিক্ষা হিন্দু মুসলমানের ভেদকে কোনও দিন প্রশ্রয় দেয়নি। এমন কি শিখ সম্প্রদায়ের মহা পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থ্ সাহেব"এ যে সমস্ত ভক্তদের রচিত সঙ্গীতাবলী পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ফরিদ ও ভিকন্ নামক দুজন মুসলমান সাধুর রচনাও বর্ত্তমান।[২] পারিপার্শ্বিক অবস্থা মারাঠা ও শিখকে দিল্লীর মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত করেছিল বলে এই সমস্ত প্রভাবকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

একদিকে পুরাতন বিধিনিষেধকে আঁকড়ে ধরে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াকে চিরজয়ী করবার আকাঙ্ক্ষা, আর একদিকে জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়ভেদকে অবজ্ঞা করে মানুষকে ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে সাধকদের অভিযান,—এই দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে মধ্যযুগের হিন্দুসমাজের ইতিহাস মুখর। ভারতীয় ইসলামের সমাজবিবর্ত্তনের ইতিহাসেও এই সংঘাত ও সমন্বয় ছাপ রেখে গিয়েছে। দক্ষিণ ভারতে আরব ও স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন রবুত্তন, লাব্বে প্রভৃতি মিশ্র সম্প্রদায়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটেছিল ভারতীয় ইসলামের সমাজদেহে। ইসলামের সমাজগঠনের এক প্রধান বিশেষত্ব তার সমদৃষ্টি। হিন্দু সমাজের মত জাতিবর্ণের ভেদ ইসলামীয় সমাজে নেই। কিন্তু ভারতের মাটিতে হিন্দুসম্প্রদায়ের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজেও হিন্দুপ্রভাবের ছোঁয়া লাগে—এবং হিন্দু অর্থে না হোক—শ্রেণীবিভাগ ছুঁৎমার্গ ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি ধীরে

১। Ranade—Rise of the Maratha Power (1900) pp 9-10, 50-51

২। Indubhushan Banerjee—Evolution of the Khalsa Vol. I p. 282

ধীরে ভারতীয় ইসলামের সমাজদেহে সঞ্চারিত হয়।[১] ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্ম্মান্তরিত, তাদের পূর্ব্বপুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু বা অমুসলমান। সুতরাং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেও তাদের জাতিভেদের সংস্কার ঘোচেনি। ১৯০১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে দেখা যায় মুসলমান সমাজে অন্ততঃ ৫৫টি জাতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। অনেক স্থানে এই বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং কোনও কোনও স্থানে এইরূপ দুইজাতির মধ্যে খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্পষ্টই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে দুই পৃথক সামাজিক সমষ্টির মধ্যে যেখানে বিবাহ ও আহারবিহার নিষিদ্ধ, সেখানে এইরূপ বিভেদকে শ্রেণীবিভেদ না বলে জাতিবিভেদ বলাই সঙ্গত। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই সকল সমষ্টির মধ্যে যে জাত্যভিমান বা প্রাক্তন সংস্কার দূর হয় নি তার অনেক প্রমাণও ডাঃ দত্ত দিয়েছেন। বাংলার অনেক মুসলমান জমীদার বংশ নিজেকে ব্রাহ্মণকূলজাত বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। পশ্চিমে রাজপুত মুসলমান বংশীয় অনেকে নিজেদের নামের পিছনে "ঠাকুর" পদবী ব্যবহার করেন। মুসলমান সমাজের বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর কতগুলি হচ্ছে আহির, আরাইন, বানজারা, ভঙ্গি, ব্রাহ্মণ, ভিল, চামার, চারণ, চুড়া, ধোবি, গুজার, জাঠ, যোগী, জোলা, লোহার, মুচি, রাজপুত, সূত্রধর, তেলী ইত্যাদি। এই সব জাতির অধিকাংশেরই এক এক অংশ এখনও হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান এবং কোনও কোনও স্থলে এইরূপ কোনও একটি জাতির দুই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের সামাজিক

১। এ সম্পর্কে ভারতের কয়েকবারের Census Report, Titus প্রণীত Indian slam,—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতীয় ইসলামের সমাজ বিবর্ত্তনের ধারাবাহিক আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ লিখতে শেষোক্ত সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতের রচনাবলী যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বন্ধন অক্ষুণ্ণ আছে। জাতিগত সংস্কারের ফলে দেখা যায় বর্ত্তমান ভারতীয় মুসলমান সমাজে বহু হিন্দুআচার প্রচলিত আছে। কচ্ছের মোমিন সম্প্রদায় সুন্নৎ করেন না এবং গোমাংস ভক্ষণ করেন না। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সিন্ জাতির মধ্যেও এই একই প্রথা বর্ত্তমান। কোনও কোনও স্থানে মুসলমান সম্প্রদায় কোনও কোনও বিষয়ে যে হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হন এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদাল, বেদিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের অস্পৃশ্য এবং "জলকর", "নানথানা" "নিকরি" প্রভৃতি মৎস্যজীবী মুসলমান সম্প্রদায় নিম্নশ্রেণীর বলে পরিগণিত হন।[১] বংশকৌলিন্য, বিবাহ ও একত্র আহারবিহার সম্পর্কে বিধিনিষেধ মুসলমান সমাজের এই অভিনব জাতিভেদকে হিন্দু জাতিভেদের প্রায় সামিল করে তুলেছে। বাংলার মোমিন শ্রেণীর নিম্নজাতীয় মুসলমানগণ উচ্চশ্রেণীর স্বধর্ম্মীদের সঙ্গে একত্র আহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত। উচ্চশ্রেণীর "থানদানী" মুসলমান বংশ বিবাহাদি ব্যাপারে স্বশ্রেণীর বাইরে পা বাড়ান না। মুসলমান রাজপুত (রঙ্গড়) অন্যজাতির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন না। রোহিল্লা পাঠানেরাও স্বীয় গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধী। সেখের সঙ্গে পাঠানের বা জাঠের সঙ্গে গুজারের বিবাহ নিষিদ্ধ। দৃষ্টান্ত আরও ঢের বাড়ানো চলে, কিন্তু আমাদের বক্তব্যের প্রমাণের জন্য এই যথেষ্ট হবে। দেখা যাচ্ছে হিন্দু সমাজের মত ভারতীয় মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ পুরো মাত্রায় বর্ত্তমান। আর্ণল্ড বলেছেন ভারতে আগত ইসলামের শ্রেণীসাম্য এবং সমদৃষ্টিই ছিল বিশেষত্ব যার ফলে অসংখ্য হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ

১। "পরিচয়" পত্রে প্রকাশিত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গের প্রধান অবলম্বন উক্ত প্রবন্ধ।

করেছিল।[১] কিন্তু হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে এসে ভারতে ইসলামের যে রূপান্তর ঘটেছিল, তা আরও উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে তাতে ইসলামের আদি শ্রেণীসাম্য শেষপর্য্যন্ত বজায় থাকেনি। এ সম্পর্কে ডাঃ দত্ত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও মনীষী মহম্মদ ইকবালের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন তা স্মরণীয়—"Is the organic unity of Islam intact in this land ? Religious adventurers set up different sects and fraternities, were ever quarrelling with one another and there are castes and sub-castes like the Hindus ! Surely we have out-Hindued the Hindu itself ; we are suffering from a double caste-system—the religious caste-system, sectarianism, and the social caste-system which we have learned or inherited from the Hindus. This is one of the quiet ways in which conquered nations revenge themselves on their conquerors." (ভাবার্থঃ এদেশে কি ইসলামের অঙ্গাঙ্গিক একত্ব রক্ষিত হয়েছে ? ভুঁইফোড় ধর্ম্মপ্রচারকের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দল সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে কলহবিবাদে লিপ্ত। হিন্দুদের মত জাতি, উপজাতি পর্য্যন্ত মুসলমানসমাজে সৃষ্টি হয়েছে। এবিষয়ে আমরা হিন্দুদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছি। আমাদের মধ্যে দুরকম জাতিভেদ দেখা দিয়েছে—এক ধর্ম্মগত জাতিভেদ, আমরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—দ্বিতীয়তঃ সামাজিক জাতিভেদ, যা আমরা হিন্দুদের কাছে শিখেছি। এই ভাবেই ক্রমেক্রমে কোন বিজিত জাতি বিজেতাদের উপর নীরবে প্রতিশোধ নেয়।) সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান যোগাযোগের প্রত্যক্ষ ফল—ভারতীয় মুসলমান সমাজের এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন।

১। T. W. Arnold—The Preaching of Islam.

চার

সংস্কৃতির মিলন

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল—তাতে বোঝা যায় যে ভারতে হিন্দুমুসলমানের যোগাযোগের ইতিহাস, স্বাভাবিক ঐতিহাসিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয়—ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে সমন্বয়ই তার বিশেষত্ব। এই যোগাযোগের ছাপ মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বক্ষেত্রেই অতি সুস্পষ্ট। আমরা অতি সংক্ষেপে এই সংস্কৃতির চারটি বিভাগের উল্লেখ করে তা দেখাবার চেষ্টা করব। এই চারটি বিভাগ হল যথাক্রমে সাহিত্য, স্থাপত্যবিদ্যা, চিত্রকলা ও সঙ্গীত।

ইসলাম এদেশে যে সাহিত্য ও সাহিত্যের ঐতিহ্য সঙ্গে করে এনেছিল, তা মূলতঃ আরবী, প্রধানতঃ পারসী এবং যৎসামান্য তুর্কী। এর মধ্যে তুর্কীসাহিত্যের বিশেষ কোনও প্রভাব ভারতীয় মানসে পড়েনি ; এর ধারা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে ক্রমশঃ মিলিয়ে গিয়েছিল। মুসলিম ধর্ম্মসাহিত্য চর্চ্চার জন্য আরবীর প্রচলন ছিল যথেষ্ট। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারসী ভাষা তার বিপুল সাহিত্যসম্ভার নিয়ে মুসলমান শাসনযুগের রাজভাষা হ'য়ে দাঁড়ায়। মুসলমান শাসকদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে যেমন ভারতের নানা স্থানে মখ্‌তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং আরবী ও পারসী ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা সুরু হয়, তেমনি প্রাচীন টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চাও পাশাপাশি চলতে থাকে। দুই একজন অত্যুৎসাহী ও ধর্ম্মান্ধ সুলতান বা বাদশাহের বিক্ষিপ্ত জবরদস্তি ছাড়া টোল, চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে এই প্রাচীন হিন্দু-শিক্ষাপ্রণালীকে মূলতঃ উচ্ছেদ করবার চেষ্টা মুসলমান শাসনযুগে

হয় নি।[১] আরবী, পারসী ও সংস্কৃত—এই তিনটি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা পাশাপাশি চলতে থাকায় এরা একে অন্যের প্রভাব এড়াতে পারেনি ; এবং এই প্রভাবের ফলে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে কতগুলি লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব ও পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। প্রথমতঃ, লক্ষ্য করবার বিষয় মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা হ'য়ে ওঠে বহুল পরিমাণে ধর্ম্মসম্প্রদায়নিরপেক্ষ। পারসী রাজভাষা হওয়ায় মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুকেও সমানভাবে তার চর্চ্চা করতে হত। এই ভাবে পারসী (যার উপর আরবী ভাষার প্রভাব ছিল প্রচুর) ভাষা, সাহিত্য ও পারসীর মাধ্যমে ইসলামীয় দার্শনিক চিন্তাধারা হিন্দুমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শাসকদের মধ্যে যাঁরা উদারভাবাপন্ন এবং দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, তাঁরা হিন্দুদের রীতিমত পারসীভাষা চর্চ্চা করতে উৎসাহ দিতেন। উদাহরণস্বরূপ সুলতান সিকন্দার লোদীর নাম করা যেতে পারে। হিন্দুদের মধ্যে সেই যুগে পারসী ভাষা চর্চ্চায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন কাশ্মিরী পণ্ডিত ও কায়স্থ এই দুই শ্রেণী। প্রথমোক্ত শ্রেণীর রচিত পারসী কাব্যসম্ভার এখনও আমাদের নিকট আদরের সামগ্রী। পারসী গদ্যরচনায়, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক রচনাতে, হিন্দু কৃতিত্বের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর মধ্যে পারসী চর্চ্চার এই জের ভারতবর্ষের উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত পুরোদমে চলেছিল। আরবী ও পারসী চর্চ্চার দ্বিতীয় ফল এই যে, এই দুই ভাষা তাদের বৈচিত্র্য ও শব্দসম্ভারের প্রভাব রেখে গিয়েছে ভারতের, বিশেষ করে উত্তরভারতের ভাষাগুলির উপরে। শেষোক্ত ভাষাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে বর্ত্তমানে অসংখ্য আরবী ও পারসী শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে। রচনারীতি ও অন্যান্য প্রভাবের

১। মুসলমান শাসনযুগে শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে Dr. N. N. Law—Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule দ্রষ্টব্য।

দিক দিয়েও আমাদের ভাষাগুলি আরবী ও পারসীর কাছে ঋণী। এই ধরণের ভাষা মিশ্রণের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত, পারসী ও সংস্কৃতবহুল হিন্দী—এই দুই এর সম্মিলনে উত্তর ভারতে উর্দ্দু নামক মনোরম এক নূতন সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি।[১] সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে উর্দ্দু উত্তর ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক উল্লেখ-যোগ্য অংশের কথ্য ভাষা, এবং এ'ভাষায় অতি সুন্দর ও লক্ষ্যণীয় একটি সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের আরবী-পারসী ভাষা চর্চ্চা আর এক কারণে সংস্কৃতির ইতিহাসে অবি-স্মরণীয়। পারসী ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্যের কতিপয় অমূল্য-গ্রন্থের অনুবাদ—ভারতের বাইরে জগতের কাছে পরিচিত হয় এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করে। একটু পরে সে কথা বলছি। সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা মুসলমানযুগে বিশেষ ব্যাহত হয়নি একথা পূর্ব্বেই বলেছি। মুসলমান শাসকবৃন্দ কেবলমাত্র যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেননি তা নয়, বহু মুসলমান শাসক সে ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অসংখ্য মুসলমান সুলতান শাসক ও ভূমিপতির সভায় হিন্দু আমলের মতই সভাকবি ও সভাপণ্ডিত নিযুক্ত থাকতেন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য, অলঙ্কার, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এঁদের বহু রচনায়, তাঁদের মুসলমান প্রভুদের প্রশস্তি দেখতে পাওয়া যায়; বাংলার এক মুসলমান শাসক মুসা খাঁ মসনদ্ আলির সভাপণ্ডিত মথুরেশ তাঁর রচিত "শব্দরত্নাবলী" নামক অভিধানে প্রভুর নিম্নোদ্ধৃত প্রশস্তি করেছেন—

যল্লক্ষ্মীর্ব্বরবৈরিণাং কুলবধূসিন্দূরবিধ্বংসিনী
যদ্বাণী ললিতা সতাং গুণবতামানন্দ কল্লোলিনী।

১। উর্দ্দুর জন্ম ও প্রসার সম্পর্কে—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা পৃঃ ৫১—৫৫

যদ্‌ক্ষোত্তর কল্পনা বিজয়িনী কর্ণাদিপৃথ্বীভুজাং
সোঽয়ং শ্রীমশনন্দএল্লিনৃপতির্জীয়াৎ চিরং ভূতলে ॥

"যাঁর সৌভাগ্যে প্রধান শত্রুবর্গের কুলবধূদের সিঁদুর মুছে যায়, যাঁর ললিত বাণী সৎ ও গুণবান্ লোকের হৃদয়ে আনন্দের নদী বইয়ে দেয়, যাঁর দান প্রাচুর্য্যে কর্ণ প্রভৃতি রাজাদের (যশ) পরাজিত করেছে, সেই শ্রীমসনদ আলি নৃপতি পৃথিবীতে চিরজীবী হোন।"[১] সম্প্রতি অধ্যাপক ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর উক্ত বিষয়ক আলোচনা থেকে, এ সম্পর্কে আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে, যা স্থানাভাবে আমরা উদ্ধৃত করতে বিরত হলাম। কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চাকে উৎসাহ দিয়েই ভারতের মুসলমানশাসকবৃন্দ ক্ষান্ত হননি, ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও সংস্কৃত চর্চ্চার অভাব ছিল না—এবং রাজসভা থেকে এই কাজে মুসলমানগণকে উৎসাহ দেওয়া হত। সুলতান মাহমুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগত সুবিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আবু রিহান বা আলবেরুণীর নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। ইনি কেবল যে সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন তা নয়, ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, পুরাণ প্রভৃতি তন্নতন্ন করে পাঠ করে তিনি তাঁর সমসাময়িক ভারতবর্ষের এক মূল্যবান বিবরণ রেখে গিয়েছেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীনের নাম পূর্ব্বেই করা হয়েছে। তিনি নিজে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং কতগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের পারসী ভাষায় অনুবাদ করান।[২] সুলতান সিকন্দার লোদীর রাজত্বকালেও দিল্লী আগ্রার বিদগ্ধ সমাজে সংস্কৃতচর্চ্চায় এবং সংস্কৃত

১। সুকুমার সেন—মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী পৃঃ ২০

২। Cambridge History of India, Vol. iii p. 282

গ্রন্থাবলীর পারসীতে অনুবাদ কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। আকবরের যুগে যে রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ব্ববেদ, গণিতশাস্ত্রের লীলাবতী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের পারসী অনুবাদ হয় একথাতো সুবিদিত।[১] তাছাড়া সংস্কৃতবিদ্ দারা সুকোর গীতা, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও উপনিষদের পারসী ভাষায় অনুবাদ, তাঁরই তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণমিশ্রের সুবিখ্যাত সংস্কৃত রূপক নাটক "প্রবোধচন্দ্রোদয়ে"র "গুলজার-ই-হাল" নামক বনোয়ারী দাস কর্ত্তৃক পারসী অনুবাদ প্রভৃতি একসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত উদাহরণ (যা আরও অনেক বাড়ানো চলত) স্পষ্টই প্রমাণ করে যে ভারতীয় মুসলমান বিদ্বৎসমাজে সংস্কৃতভাষার প্রতি অনুরাগ ও এই ভাষার চর্চ্চা মোটামুটি আগাগোড়াই বর্ত্তমান ছিল। সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি মুসলমান যুগে খুব বেশী না হ'লেও দর্শন, অলঙ্কার, তর্কশাস্ত্র, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ে নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়েছিল। প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে লক্ষ্যণীয় সাহিত্যের বিকাশ মুসলমান শাসনকালীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি জগতে স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখতে পাই—মুসলমান আমল এক হিসাবে এর স্বর্ণযুগ। মুসলমান বিজেতারা উত্তর ভারতের ভাষাকে "হিন্দী" বা "ভারতের ভাষা" এই সাধারণ নামে অভিহিত করতেন। আরবী ও রাজভাষা পারসীকে বাদ দিলে এ দেশীয় প্রচলিত ভাষা হিসাবে তাঁরা হিন্দীকে স্বীকার করতেন এবং তাঁর চর্চ্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে উর্দ্দু প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর রাজদরবারে—মথুরা, বৃন্দাবন, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ব্রজভাষা নামক হিন্দীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপটিই স্বীকৃত হ'ত এবং এই ভাষা স্বয়ং সম্রাটগণের আদর পেত। আওরংজেবের সময়ে

১। Smith—Akbar p. 423

দিল্লীর মুঘল দরবারের অভিজাতবর্গের শিক্ষার জন্য ব্রজভাষার সাহিত্য অলঙ্কার ও ব্যাকরণ বিষয়ক পুস্তক পারসী ভাষায় রচিত হয়। দাক্ষিণাত্যেও প্রচলিত তামিল তেলেগু ও কানাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার পাশাপাশি চতুর্দ্দশ শতক থেকে উত্তর ভারতের মুসলমান আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে উত্তরভারতীয় হিন্দীর প্রচলন হয়। দাক্ষিণাত্যে মুসলমানগণকর্ত্তৃক নবপ্রচলিত এই হিন্দী ভাষার নামকরণ হয় "দক্‌নী" বা দক্ষিণী-ভাষা।[১] এইভাবে হিন্দী শুধু যে মুসলমান শাসকবৃন্দের আনুকূল্য লাভ করল তা নয়, ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা করতে লাগলেন। সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর সমসাময়িক পারসী ভাষার সুবিখ্যাত কবি আমির খসরু হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীনের নাম পূর্ব্বে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং হিন্দী ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং আরবী ও পারসী গ্রন্থের হিন্দীতে অনুবাদ করান।[২] হিন্দী ভাষায় মুসলমান রচিত গ্রন্থের মধ্যে পাঞ্জাবের বাচা ফরীদুদ্দীন গঞ্জ শকরের পদাবলী, কোসলের সুফীসাধক মালিক মুহম্মদ জায়সী প্রণীত "পদ্‌মাবতি" কাব্যগ্রন্থ, রাসখাঁ'র কবিতাবলী উল্লেখযোগ্য।[৩] হিন্দী ভাষার আর একজন প্রখ্যাত মুসলমান লেখক সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ও তাঁর সভাসদ খান খানান মির্জ্জা আবদুর রহিম। মুঘল রাজসভায় সাধারণভাবে ব্রজভাষার চর্চ্চার কথা তো পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত হিন্দী বা "দক্‌নী" ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য মুসলমান লেখকের অভাব ছিল ছিল না। বিজাপুরের শাহ মীরনজী, এবং তাঁর পুত্র শাহ বুরহানুদ্দীন

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা পৃঃ ৪৮, ৪৯, ৫০

২। Cambridge History of India Vol III p. 282

৩। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা পৃঃ ৫০

জানম্, আহ্‌মদাবাদের মিয়া খূব মুহম্মদ চিশতী, গোলকুণ্ডার বিখ্যাত সুলতান মুহম্মদ কুলী কুতব শাহ, মোল্লা রজ্‌হী প্রমুখ সাধক ও সাহিত্যিকবৃন্দের রচনাবলী এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন।[১] এ ছাড়া এই যুগে কবীর, দাদূ, মীরাবাই, রজ্জব প্রভৃতি সাধকদের রচিত পদ ও সঙ্গীত হিন্দী সাহিত্যকে প্রচুর সমৃদ্ধ করেছে। সম্রাট আকবরের সভাসদ রাজা বীরবল, রাজা মানসিং, রাজা ভগবান দাস, নরহরি মহাপাত্র এবং হরিনাথ প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যের সুবিখ্যাত লেখক ছিলেন। হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন মহাকবি তুলসীদাস সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর "রামচরিতমানস" একবাক্যে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পাবার যোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।[২] সুরদাস, বিঠলনাথ, কুম্ভনদাস প্রভৃতির রচনাও হিন্দী সাহিত্যে বিখ্যাত। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই যুগ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতানুসারে বাঙ্গলার মুসলমান সুলতান ও শাসকবৃন্দের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা লক্ষ্যণীয় রূপে আরম্ভ হয়। দীনেশ বাবুর মত হয়তো সর্ব্বাংশে আজকে অনেকে মানতে চাইবেন না। তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বাঙ্গলায় মুসলমান শাসনকালে বাঙ্গলা সাহিত্য রাজশক্তির সমর্থন পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কালে কেবল যে বাঙ্গলা ভাষায় নানা সাহিত্যিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তা নয়, অনেক সাহিত্যিক তাঁর আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।[৩] তাঁরই অধীনস্থ সেনাপতি

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ঐ

২। তুলসীদাসের কাব্য ও ধর্ম্মমত সম্পর্কে Carpenter—Theism in Medieval India pp. 507-19 দ্রষ্টব্য।

৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৬২-৬৩

পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদিপর্ব্ব থেকে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্যে স্বনামধন্য রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী সুলতান হোসেন শাহের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, অবশ্য যদিও তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল সেই কর্ম্মত্যাগের পরে। কুলীনগ্রামবাসী বাঙ্গলা ভাষায় ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু সুলতান রুকুনুদ্দীন বারবক্ শাহের অধীনে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদের পিছনে সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের উদ্যম বিদ্যমান; ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যগ্রন্থে আমরা মুসলমান শাসনকর্ত্তা বারাখাঁ'র সপ্রশংস উল্লেখ ও মুসলমান গাজি, পীর, আউলিয়া প্রভৃতির বন্দনা দেখিতে পাই।[১] এই সব নানা দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেবল তাই নয়; মুসলমান লেখকেরাও বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য রচনার কাযে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শাবিরিদ খান রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য উল্লেখযোগ্য। হিন্দী ভাষায় মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত কাব্য "পদুমাবতি" অবলম্বনে বাঙ্গলায় কাব্য রচনা করেন সৈয়দ আলাওল। কবি দৌলত কাজি, কবি মহম্মদ খাঁ, কবি আবদুল নবী, কবি সৈয়দ সোলতান প্রভৃতি, এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদরচয়িতা সৈয়দ মর্ত্তুজার নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্ম্মালম্বী আরাকান রাজগণের সভায় যে বাঙ্গালা সাহিত্য গড়ে ওঠে, তার মূলে ছিলেন প্রধানতঃ বাঙালী মুসলমান কবিরা। মৌলিক রচনা ছাড়া পারসী কাব্যের কিছু কিছু বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ-মুসলমানী ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা প্রভৃতি, এই যুগে বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান

১। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ—মনসামঙ্গল (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত) প্রথম খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৫৭-৫৮

লেখকবৃন্দের বিশিষ্ট দান। তা ছাড়া এই যুগেই বাংলার বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ প্রভৃতির অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, চরিতকাব্য, কড়চা প্রভৃতি এই যুগেই বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির দল, রামায়ণকার কৃত্তিবাস, মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর লেখক মুকুন্দরাম প্রভৃতি যে কোনও সাহিত্যের গৌরব বিবেচিত হতে পারেন। দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলিতেও এই যুগে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্ট হয়। বিজয়নগররাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তেলেগু সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তামিল সাহিত্যও এই যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমপ্রগতি এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগীয় ভক্তি-আন্দোলন বহুল পরিমাণে এই সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কার্য্যকরী হয়। এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে আহমেদনগরের নিজামশাহী সুলতানগণ মারাঠীকে নিজেদের দরবারে রাজভাষা হিসাবে স্থান দেন—যার ফলে এই ভাষার যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়।[১] উপরের উদাহরণগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—যে ভারতের মুসলমান শাসকবর্গ এদেশের মাটিকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই প্রদেশে প্রদেশে তাঁরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্থানীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রচারক। মধ্যযুগে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের যে প্রাণপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা প্রমাণ করে যে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে সমস্ত আপাতঃ বিরোধ ছাপিয়ে পরস্পরকে বোঝবার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা কত গভীর ছিল।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্থাপত্যবিদ্যাতে হিন্দু-মুসলিম ধারার মিলন যতটা লক্ষ্য করা যায়—আর কিছুতেই তেমন নয়। বলে রাখা ভাল ইসলামে

১। Tarachand-Influence of Islam on Indian Culture pp 250-51

মূর্ত্তিপূজা ও মূর্ত্তিগঠনের বিধান না থাকায় ইসলামের ইতিহাসে ভাস্কর্য্য বা Sculpture এর কোনও স্থান নেই। পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন যে ভারতবর্ষে যে মুসলিম স্থাপত্যবিদ্যা বিকাশ লাভ করেছিল—পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের স্থাপত্যের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে।[১] এই প্রভেদের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—ভারতের মাটিতে হিন্দু নির্ম্মাণ রীতির সঙ্গে সংমিশ্রণ এবং তৎজনিত হিন্দুপ্রভাব এর জন্য দায়ী। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ইসলামের উপর হিন্দু প্রভাবের কথা বিশদ করে বলেছেন হ্যাভেল। দিল্লী, আজমীর, আগ্রা, গৌড়, গুজরাট, জৌনপুর প্রভৃতি সকল স্থানের মুসলিম স্থাপত্যের উপর হ্যাভেল দেখেছিলেন হিন্দু শিল্প ও চিন্তাধারার প্রভাব।[২] ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে আধুনিক লেখকগণ হ্যাভেলের উক্তি সর্ব্বাংশে না মানলেও হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য যে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল এবিষয়ে একমত। ইসলাম-আনীত স্থাপত্যের নব আদর্শগুলি পাথরের কাজে ভারতবাসীর স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে—ভারতের মাটিতে নব জীবন লাভ করেছিল। জনৈক আধুনিক লেখক যথার্থ বলেছেন—"But the real excellence of Indo-Islamic architecture was due to the second of these factors—the living knowledge and skill possessed by the Indian craftsmen, particularly in the art of working in stone, in which they were unequalled. This perfection had been achieved through centuries of experience in temple building the manipulation of stone, in all parts of the country, having been practised on a scale, which raised it to the status of a national

১। The Legacy of India (edited by G. T. Garrat) p. 223

২। Havell-Indian Architecture p. 101

industry......How this manipulative skill was adapted and directed to the production of scientific, as well as artisfic architecture is seen in the monuments that arose in India under Islamic rule."[১] (ভাবার্থঃ ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতা বিশেষতঃ পাথরের কাজে তাদের অতুলনীয় নৈপুণ্য ভারতীয় মুসলমান স্থাপত্যের উৎকর্ষের দ্বিতীয় কারণ। বহুশতাব্দী-ব্যাপী মন্দির নির্ম্মাণের অভিজ্ঞতা থেকে তারা এই দক্ষতা লাভ করেছিল, পাথরের কাজ দেশে চারিদিকে এত বেশী হ'ত যে তাকে জাতীয় শিল্পের পর্য্যায়ে ফেলা চলে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রমণীয় স্থাপত্য-কলা গড়ে তুলতে এই কলানৈপুণ্যকে যে কি ভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল—তা মুসলমান যুগের স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি দেখলে বোঝা যায়।) হিন্দু শিল্পরীতির অলঙ্করণের প্রতি ঝোঁক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারু-কার্য্য মুসলমান স্থাপত্যে গৃহীত হল। অপরপক্ষে ইসলাম সঙ্গে করে নিয়ে এল খিলান ও গম্বুজের রেওয়াজ ও নির্ম্মাণরীতির অনাড়ম্বর ও প্রায় জ্যামিতিক সরলতা। এই দুইএর সংমিশ্রণে গড়ে উঠলো এক অপূর্ব্ব স্থাপত্যরীতি যা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিক থেকে স্থাপত্যজগতে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারে, এবং যার দান,—ফতেপুর শিক্রী, মোতি মসজিদ, ইৎমাৎ-উদ্দৌলা আর তাজমহল। এই যুগের হিন্দু স্থাপত্যের উপরও রয়েছে মুসলমান প্রভাবের স্পষ্ট নিদর্শন। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—সম্রাট আকবরের যুগে নির্ম্মিত (এর দু'একটি আকবরের মৃত্যুর পরেও নির্ম্মিত হয়েছিল) বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি, বিশেষ করে গোবিন্দদেবের মন্দির।[২] সাধারণ ভাবে হিন্দু মুসলিম শিল্পরীতি পরস্পরকে প্রভাবিত

১। Percy Brown-Indian Architecture Vol II (Islamic Period) p. 2

২। Percy Brown—Indian Architecture Vol I (Buddhist & Hindu Period) pp. 153-54 ; V. A. Smith—Akbar pp. 445-46

তো করেছিলই, তা ছাড়া ভারতের নানা প্রদেশে মুসলমান আমলে যে সকল প্রাদেশিক স্থাপত্যধারা গড়ে উঠেছিল—সে সবের উপর প্রাক্তন হিন্দুপ্রভাব বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছিল। প্রাচীন বাঙ্গলার স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়, বাঁশের উপর, খড়ের ছাউনী দেওয়া বাঙ্গলার কিঞ্চিৎ বক্রাকৃতি চালের ছাদবিশিষ্ট আবাস গৃহের আদর্শে মসজিদ, সমাধি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করবার রীতি স্থাপত্যে প্রচলিত হ'য়েছিল। গৌড়ের মুসলিম কীর্ত্তির মধ্যে দুটি একটি এই জাতীয় নিদর্শন আমরা পাই। এই জাতীয় মন্দিরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ জোড়-বাঙ্গলা মন্দির।[১] হিন্দু মুসলিম শিল্পরীতির এই সংমিশ্রণ ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিল্পের ক্ষেত্রেও, আমরা একই সমন্বয়ের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। Marshall এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি খুবই সত্য: "In the fusion of the two styles, which followed, Mahammadan Architecture absorbed or inherited manifold ideas and concepts from the Hindu—so many indeed that hardly a form or motif of Indian architecture which did not find its way into the buildings of the conquerers. But more important than these visible borrowings of outward and concrete feature, is the debt which Indo-Islamic architecture, owes to the Hindu, for two of its most vital qualities, the qualities of strength and grace. In other countries, Islamic architecture has other merits......but in no other country, are strength and grace, united quite so

১। Percy Brown—Indian Architecture Vol I p. 188; Vol II. p. 36

perfectly as in India. These are the two qualities which India may justly claim for her own and they are the two which in architecture count far more than all the rest."[১] (ভাবার্থ: উভয় শিল্পরীতির মিশ্রণ ব্যাপারে মুসলিম স্থাপত্য হিন্দুস্থাপত্যের কাছে এতভাবে ঋণী; যে শেষোক্ত শিল্পের এমন কোনও বিষয়বস্তু বা প্রকাশভঙ্গী নেই যা আমরা মুসলিম স্থাপত্যে দেখতে পাই না। কিন্তু ঐ সমস্ত বাহ্য ঋণের কথা ছেড়ে দিলেও মুসলিম স্থাপত্য তার দুটি প্রধান গুণের জন্য হিন্দু স্থাপত্যের কাছে ঋণী। এই গুণ দুটি হচ্ছে—দৃঢ়তা এবং শালীনতা। অন্যান্য দেশে মুসলিম স্থাপত্যের অপরাপর অনেক গুণ আছে……কিন্তু উপরিউক্ত গুণ দুটির এমন অপুর্ব্ব সমাবেশ ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না এবং ঐ হ'ল ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। স্থাপত্যবিদ্যায় এই গুণ দুটির প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।) শিল্পকলার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যদিও তা ঠিক স্থাপত্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং একে শিল্প বলতেও অনেকে হয়ত ইতস্ততঃ করবেন। বিষয়টি হচ্ছে মুসলমান যুগের মুদ্রাতত্ত্ব। প্রাচীন গ্রীক, রোমান, ভারতস্থ গ্রীক রাজবংশীয় বা ভারতের গুপ্তরাজবংশীয় মুদ্রার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে—তিনি এই সকল যুগের মুদ্রাগুলিকে উচ্চশ্রেণীর শিল্পকার্য বলে গণ্য করতে দ্বিধা করবেন না। ভারতে মুসলিম রাজবংশাবলীর মুদ্রাতত্ত্ব আলোচনা করলে তার মধ্যে বহু হিন্দুপ্রভাব আবিষ্কার করা যায়। প্রথমতঃ মুদ্রার মান বা weight মুসলিম শাসনের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে চিরাচরিত হিন্দু প্রথানুযায়ী (রৌপ্য মুদ্রা পুরাণ ৩২ রতি, তাম্রমুদ্রা কার্ষাপণ, ৮০ রতি) নির্দ্ধারিত হ'ত। এর কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছিল সত্য কিন্তু সে অনেক পরের

১। Cambridge History of India, Vol III p. 571

কথা। মুদ্রার উপরিস্থিত প্রতীক বা coin-type হিসাবে, হিন্দুযুগের কিছু কিছু প্রতীক প্রথম দিকে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ষণ্ড বা ষাঁড়ের প্রতীক—সুলতান মহম্মদ বিন সামের লক্ষ্মী প্রতীক, ঘোড়-সওয়াড় প্রতীক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মনে রাখা উচিত এই জাতীয় প্রতীক ব্যবহার খাঁটি ইসলামসম্মত নয়। সুলতান মাহ্‌মুদের পাঞ্জাবে প্রচারিত রৌপ্য টঙ্কার উপর আমরা ইসলামের কলেমার সংস্কৃত অনুবাদ পাই।[১] বহু মুসলমান সুলতান তাঁদের মুদ্রার উপর ভারতের স্থানীয় লিপি ব্যবহার করছেন এবং মুদ্রার প্রচলনের সুবিধার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজাদের নাম ও নিজেদের নামের সঙ্গে সঙ্গে উৎকীর্ণ করিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বক্তব্য, মুসলমান শাসকদের মুদ্রার উপর "শ্রী হম্মীর" "চহড় দেব", "সামন্তদেব" প্রভৃতি মধ্যযুগীয় হিন্দু রাজাদের নাম দেখা যায়। এ ভিন্ন মুসলমান সুলতানদের প্রায় সকলেই দেশীয় ভাষায় ও লিপিতে নিজেদের নাম লিখবার সময় নামের সঙ্গে সম্মানসূচক "শ্রী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন—যেমন, "সুরিতান শ্রীআলাবদিন" (সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ্), "শ্রীমহমদ বিনি সাম" (সুলতান মুহম্মদ বিন সাম), "শ্রীসুলতাং গয়াসুদীং" (সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক), "শ্রীসুলতাং জলালুদীং" (সুলতান জালালুদ্দীন ফিরুজশাহ), "শ্রীসেরশাহ" (সুলতান শেরশাহ), ইত্যাদি[২]। বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত গোঁড়া সাম্প্রদায়িক নেতা মুসলমানদের ভয় দেখাচ্ছেন যে "শ্রী" কথাটি উচ্চারণ করলে তাদের ধর্ম্মনাশ হবে—ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ করবার মত উদারতা তাদের মনে কোনও দিন আসবে কি? এর পরবর্ত্তী যুগে মুঘল সম্রাট আকবর ও

১। C. J. Brown – Indian Coins p. 69

২। "Some Hindu Elements in Muslim Coinage of India" by S. K. Chakravarti—In the Proceedings of the Third History Congress (Calcutta 1939) pp. 672-86

জাহাঙ্গীরের শাসনকালে, মুদ্রার উপরে সম্রাটের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করবার প্রথা সুরু হয়। এই রীতি প্রাক-মুসলমান ভারতের প্রথানুযায়ী হ'লেও মোটেই মুসলমান শাস্ত্রসম্মত ছিল না। আকবরের ও জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতিসম্পন্ন মোহরগুলি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। (জাহাঙ্গীরের এই জাতীয় মুদ্রা অবশ্য মুদ্রা হিসাবে বাজারে চলে নি—তবু সেগুলি প্রকাশ্যে বিতরিত হওয়াটাই প্রমাণ করে যে—সেগুলির প্রচলন কোনও বিধিনিষেধের দ্বারা আবদ্ধ ছিল না।)[১] পূর্ব্বতন হিন্দুসংস্কৃতি ভারতবর্ষে ইসলামের আচার বিচারের উপর কতটা স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল—মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনা তা প্রমাণ করে।

মুসলমান যুগে মুঘল শাসনের সময়—ভারতীয় চিত্রকলা আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করেছিল। এক্ষেত্রে হিন্দু ভারতের কৃতিত্ব অসাধারণ। অজন্তা, বাগ, সিগিরিয়া (সিংহল), ইলোরা প্রভৃতি স্থানের চিত্রাবলী, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশালায় স্থান পাবার যোগ্য। পুঁথিচিত্রণের কাযেও প্রাক্-মুসলমান যুগের শিল্পীরা যথেষ্ট কৃতবিদ্য হ'য়েছিলেন। সুতরাং ইসলামের সঙ্গে যে নূতন চিত্রকলা ভারতে প্রবেশ করে—তা সংস্পর্শে আসে ভারতীয় চিত্রশিল্পের এই বিরাট ঐতিহ্যের সাথে। মুঘল শিল্প বলতে যা বোঝায় তাতে বহিঃভারতীয় অংশ যেটুকু আছে তার উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকাশ হয়—ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার হিরাট ও সমরখন্দে। এইখানে তিমুর বংশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পারসী শিল্পধারার প্রভূত উন্নতি হয়। তার মধ্যে চীনদেশীয় অঙ্কণপদ্ধতির প্রভাবও পুরোপুরি ছিল।[২] এই রীতির তৎকালীন দুই প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন—বিহ্‌জাদ ও আগা মিরাক। মুঘল রাজবংশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে

১। Ibid p. 679; Hodivala—Historical Studies in Mughal Numismatics pp. 149, 153.

২। Percy Brown—Indian Painting p. 47

এই মিশ্র মঙ্গোলীয়-পারসীক শিল্পধারা ভারতে আনীত হয়। দরবারী শিল্প হিসাবে ছিল এর প্রতিষ্ঠা এবং ভারতবর্ষে হিন্দু শিল্পরীতির সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ এর লক্ষ্যণীয় পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে। বর্ত্তমানে মুঘল চিত্রকলা বলতে আমরা যা বুঝি তা এই সংমিশ্রণের ফল। ধারাবাহিক ভাবে মুঘল শিল্পের আলোচনা করলে পুরোপুরি মঙ্গোলীয়-পারসীক অঙ্কণ-পদ্ধতি থেকে ভারতীয় পদ্ধতিতে তার ক্রমরূপান্তর সহজেই চোখে পড়ে।[১] বাবর এবং হুমায়ুন উৎসাহী শিল্পরসিক হলেও জীবনে শিল্প নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় বেশী পান নি; আকবরের সময় থেকেই মুঘল রাজদরবারে রীতিমত শিল্পচর্চ্চা আরম্ভ হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে আবুল ফজল বর্ণিত আকবরের সভার সতেরো জন শিল্পীর মধ্যে তেরো জনই ছিলেন হিন্দু। আবুল ফজল এদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন।[২] এদের মধ্যে বসওয়ান, দস্‌ওয়নাথ কেসু, মুকুন্দ প্রভৃতির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। বিদেশী চিত্রকরের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম ছিল। একাধিক চিত্রকর একযোগে একটি শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্তও এই যুগে আছে। আকবরের প্রকৃতি-প্রীতি তাঁকে চিত্রকলার একজন সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক করেছিল।[৩] জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল মুঘলচিত্রের স্বর্ণযুগ বলে বর্ণিত হয়েছে। এযুগে কয়েকজন শিল্পী বাইরে থেকে ভারতে আমদানী হলেও মোটামুটি ভারতীয় শিল্পীদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। বিষণদাস, মনোহর, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি এই যুগের হিন্দু চিত্রশিল্পিগণ বিখ্যাত। আগা রিজা, আবুল হাসান, মনসুর, ফারুক বেগ প্রভৃতি

১। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তাঁর Studies in Mughal India গ্রন্থে দৃষ্টান্ত সহকারে একথা ব্যাখ্যা করেছেন।

২। Smith—Akbar p. 430

৩। L. Binyon—The Court Painters of the Grand Moguls pp 40 ff.

প্রসিদ্ধ মুসলিম শিল্পিগণও এই সময়ের লোক। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রের অবনতি আরম্ভ হয়—এবং আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামীর ফলে তা ক্রমশঃ দ্রুততর হয়।[১] আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্ব্বল বংশধরদের রাজসভায় লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার নবাবগণের আমলে মুঘল শিল্পের কিছু কিছু অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু সে না থাকার মধ্যেই। মুঘল যুগের শিল্পীরা বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে খুব উদার ছিলেন—হিন্দু এমন কি ক্রীশ্চান ধর্ম্মসম্পর্কিত বিষয় নিয়েও চিত্র অঙ্কিত হত। মুঘল রাজদরবারে চিত্রশিল্প ছাড়াও মুঘল যুগে রাজপুত চিত্রের বিকাশ উল্লেখযোগ্য।[২] রাজপুতানা ও পাঞ্জাবে এই শিল্পকলার যথেষ্ট উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। এ শিল্পের বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্মমূলক হলেও মুসলমান যুগে তার পরিণতি ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। আওরংজেবের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুঘল রাজসভায় ও দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের নিকট এই শিল্পের আদর ছিল। মুসলমান যুগের চিত্রকলার আলোচনা প্রমাণ করে যে সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত, এক্ষেত্রেও হিন্দুমুসলিম প্রতিভার সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল।

সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় প্রাচীন হিন্দুযুগে ভারতীয় সঙ্গীতের যথার্থ রূপটি কি ছিল,—তা আমাদের জানা নেই। ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশী, নারদের সঙ্গীত-মকরন্দ, শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকর, দামোদরের সঙ্গীত-দর্পণ, লোচনের রাগতরঙ্গিণী, অহোবলের সঙ্গীত পারিজাত প্রভৃতি

১। Ibid pp 62 ff

২। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাচীন ভারতের গুহাশিল্পের প্রভাব রাজপুত চিত্রকলার মূলে ছিল। বিস্তারিত আলোচনার জন্য কুমারস্বামী প্রণীত Rajput Painting দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য Brown-Indian Paintiug pp 54-60, 99-110

এই বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থগুলির কোনটিই খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের নয়, কতগুলি তো অনেক পরবর্ত্তী রচনা। এই গ্রন্থগুলিতে হিন্দুযুগের সঙ্গীতের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে, সে আশা দুরাশা। ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরলিপি সংরক্ষণের প্রথা প্রচলিত না থাকায়—এই সঙ্গীতের প্রাচীনতম অধ্যায়ের ব্যবহারিক রূপেরও কোনও নিদর্শন আমরা পাই না। কোনও কোনও লেখক ভারতীয় সঙ্গীতের অধুনা প্রচলিত একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ধ্রুপদকে প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের নিদর্শন বলে মনে করেন—কিন্তু এই মত বিশেষজ্ঞ মহলে গৃহীত হয় নি। প্রাক্-মুসলমান যুগের ভারতীয় সাহিত্য ঘেঁটে এইটুকু খবর পাওয়া যায় যে হিন্দুযুগে সঙ্গীত-শিল্প যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল—এবং তত্ত্ব ও ব্যবহার এই দুই দিক থেকেই সঙ্গীত হিন্দু চিন্তাধারা ও সমাজজীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল। সঙ্গীতকলা বলতে অবশ্য হিন্দু ভারতে গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনটি শিল্পকে একত্র বোঝাতো। মুসলমানগণ তাঁদের সঙ্গে যে সঙ্গীতধারা ভারতবর্ষে নিয়ে এলেন—তাতে পারস্যের প্রভাবই ছিল সমধিক। তাঁদের আমলে প্রাক্-মুসলমানযুগের হিন্দু মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে এই নবাগত বিদেশী সঙ্গীতের মিশ্রণ হল। মুসলমান যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের মধ্যে আর একটি প্রভাব আবিষ্কার করা যায়—তা হল দেশী সঙ্গীতের প্রভাব। সঙ্গীতশাস্ত্রের একটি প্রাচীন পুস্তকে দেশী সঙ্গীতের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

"দেশে দেশে রুচ্যা যজ্জনহৃদ্রঞ্জন তু সা দেশী।
স তু লোকরুচিবিকলিত প্রায়ো লক্ষ্যাত্র দেশীতৎ ॥"

ভাবার্থ—দেশী হচ্ছে সেই সঙ্গীত যা জনসাধারণের হৃদিরঞ্জক এবং বিভিন্ন স্থানে লোকরুচিসম্মত হ'য়ে বিরাজমান। উচ্চ শ্রেণীর শাস্ত্রসম্মত মার্গ সঙ্গীতের পাশাপাশি—ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই দেশী সঙ্গীত বিকাশলাভ করেছিল প্রাচীন কাল থেকে। এর

আধুনিক নিদর্শন বাঙ্গলার কীর্ত্তন, বাউল, জারী, মারাঠী আভঙ্গ—বিহার, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলের ভজন সঙ্গীত, উড়িষ্যার ছান্দ প্রভৃতি। সমগ্র মুসলমান যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস শাস্ত্রীয় হিন্দু মার্গসঙ্গীত, বিদেশী পারসী সঙ্গীত ও দেশী সঙ্গীত এই ত্রিধারার সংমিশ্রণ ও তার ফলে সঙ্গীতের নব নব অধ্যায় সৃষ্টির কাহিনী। এই সময়ে সঙ্গীতের ঠাটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে এবং নূতন নূতন ঢংএর সুরও সৃষ্টি হ'তে থাকে। ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য গুণী স্রষ্টা ও সুরশিল্পীর নাম অমর হয়ে থাকবে। গোয়ালিয়রের হিন্দু শাসক রাজা মান জন্ম দিলেন ধ্রুপদের। ভারতীয় সঙ্গীতের আর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ খেয়ালের উৎপত্তি যে মুসলমান রাজসভায় এবিষয়ে কোনও মতদ্বৈত নেই। একমত অনুযায়ী সুবিখ্যাত কবি ও মনীষী আমীর খসরু খেয়ালের জন্মদাতা—এবং এর প্রথম যুগে—খেয়ালের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জৌনপুরের সুলতান হোসেন শা। মতান্তরে খেয়ালের জন্ম বাদশা মহম্মদ শা রঙ্গীলের আমলে—এর জন্মদাতা সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ নামক গায়কদ্বয়। টপ্‌পা সঙ্গীতের জন্মের মূলে সম্ভবতঃ মুসলমান সুরশিল্পীর প্রতিভা রয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—ভারতবর্ষের আধুনিক বাদ্যযন্ত্রসমূহ অধিকাংশই মুসলমান যুগে তাদের বর্ত্তমান রূপ ধারণ করেছে—যদিও হিন্দুযুগে সেগুলির অধিকাংশই কিছুটা অন্য আকারে প্রচলিত ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সেতার (হিন্দুযুগের—চিত্রা ?)—এসরাজ (হিন্দুযুগের পিণাকীবীণা ?), স্বরোদ, রবাব, সুরবাহার, সুর শৃঙ্গার (হিন্দুযুগের বিপঞ্চী ?), তবলা প্রভৃতি যন্ত্র বর্ত্তমান আকারে জন্মগ্রহণ করে মুসলমান আমলে। বীণ্, নানা আকারের বাঁশী, মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ প্রভৃতির চল তো হিন্দুযুগ থেকে একটানা ভাবেই ছিল

১। অমিয় নাথ সান্যাল—প্রাচীন ভারতে সংগীত চিন্তা পৃঃ ৬

বলে জানা যায়।[১] মুসলমান আমলের গানবাজনার সমজ্‌দার বহু সুলতান রাজা ও বাদশার কথা আমরা জানি। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন্‌, বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানগণ, গোয়ালিয়রের হিন্দুরাজা মান তানোয়ার, আওরংজেব বাদে আর সমস্ত মুঘল সম্রাটগণ স্বীয় স্বীয় দরবারে গানবাজনার যথেষ্ট আদর করতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গুণীরা সমান উৎসাহে সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজসভায় সঙ্গীত চর্চ্চা সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেছেন "There are numerous musicians at court, Hindus, Iranis, Turanis, Kashmiris, both men and women. The court musiciains are arranged in seven divisions, one for each day of the week."[২] ভাবার্থ: রাজসভায় হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরী প্রভৃতি অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ সঙ্গীতজ্ঞ আছেন। সভা গায়কদের সাতটি বিভাগ আছে সপ্তাহের প্রতিদিনের জন্য এক একটি বিভাগ নিযুক্ত থাকে।) আমীর খসরু, বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক, ভানু, ডালু, ভগবান, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ মিঞা তানসেন, মালবের রাজ বাহাদুর প্রভৃতি বরেণ্য হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞের নাম মুসলমান যুগের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছে। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে সমসাময়িক গায়ক ও বাদকগণের যে সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সঙ্গীত-চর্চ্চার উৎসাহ এবং প্রচলন সে সময়ে কত বেশী ছিল?[৩] সঙ্গীত-কলা-লক্ষ্মীর অন্দরমহলে কোনও দিনই সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রবেশ করে তাকে কলুষিত করেনি। হিন্দু

১। **অমিয় নাথ সান্যাল—ঐ পৃঃ ৮-১১**

২। **Ain-i-Akbari (translated by Blochman) vol i (2nd ed. 1927) p. 681**

৩। **Ibid pp. 681-82**

সুরশিল্পীর মুসলমান শিষ্য থাকা এবং মুসলমান ওস্তাদের হিন্দু শিষ্য থাকা সঙ্গীতজগতে অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার—যা আজ পর্য্যন্ত সমানে চলে আসছে—এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটেনি। মুসলমান যুগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-প্রতিভা—মিঞা তানসেনের সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন হিন্দু বৈষ্ণব সাধক হরিদাস স্বামী। দ্বিতীয়তঃ রচনার দিক থেকেও ওস্তাদদের দ্বারা গীত গানগুলিও লক্ষ্য করবার মত। ধ্রুপদ সঙ্গীত অধিকাংশই ভক্তি রসাত্মক এবং হিন্দু দেবদেবীর মহিমা বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই তার বিষয়বস্তু। কিন্তু মুসলমান ধ্রুপদীরা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য আসরে নিঃসঙ্কোচে তা গেয়ে থাকেন—তাদের সাম্প্রদায়িক বোধ এতটুকু পীড়িত হয় না। মিঞা তানসেনের রচিত ধ্রুপদ সঙ্গীতগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই দেখা যাবে তার অনেকগুলিই হিন্দু দেব-দেবীর স্তব। আবার রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক ঠুংরি গানগুলিতেও মুসলমান গুণীদের কৃতিত্ব অসাধারণ এবং সর্ব্বস্বীকৃত। অপর পক্ষে হিন্দু গায়ক গায়িকাগণ মুসলমান ওস্তাদদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে, তাদের গায়কী চাল গ্রহণ করতে কখনও দ্বিধা করেননি। এর থেকে প্রমাণ হ'চ্ছে সুরের রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম গুণীরা কোনও দিন জাতিভেদ বা সম্প্রদায় ভেদ মানেননি। মিশ্রণ এবং সমন্বয়কে তাঁরা সানন্দে মেনে নিয়েছেন। এইখানে অত্যন্ত দুঃখের সহিত একজন বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞের মত উল্লেখ করব। ভারতীয় সঙ্গীতের গায়কী পদ্ধতিকে ইনি হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করেছেন। এঁর ভাষায় "The difference between Mohammedan and Hindu singing is more easily telt than described. One's general impression, which a longer stay would have corrected in detail, is that the Mohammedan prefers the more cheerful *rags*,—

Khamaj, Kafi and the Kalians; and the simpler rhythms —such as Tiṭala and Dadra ; and the Rondo to the variation form. With these he takes a considerable amount of liberty, concealing the rhythm, especially by interspersed rests and broken phrases that run counter to it, so that it would be unintelligible, sometimes without the drummer. He has the performers instinct ; he rivets the attention of the audience as a whole and the lěss able singer is apt to tear a passion to pieces, rather than not challenge their admiration. ...All these the Hindu can do too, but be does it in a less vivacious way. He is at his best in quieter *rags* like Bhairavi or the more characteristic such as Vasant or Todi and in the more irregular rhythms such as Surphakta or Ada Chautal. His singing is less broken up with rest and he luxuriates in cross rhythms. His song gives much more the impression of coming from the heart and of reaching out for sympathy rather than for applause." [১] (ভাবার্থঃ মুসলমান ও হিন্দু গায়কী রীতির পার্থক্যটা যত সহজে অনুভব করা যায় তত সহজে বর্ণনা করা যায় না। আমার মোটামুটি ধারণা—মুসলমান গায়কবৃন্দ কাফি, খাম্বাজ, কল্যাণের বিভিন্ন রূপ, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত লঘু ও আনন্দোজ্জ্বল রাগগুলি বেশী পছন্দ করেন। তালের ক্ষেত্রেও তাঁরা ত্রিতাল, দাদরা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত

১। A. H. Fox-Strangways—The Music of Hindostan (1914) pp. 89-90.

সরল তালগুলির উপরই বেশী ঝোঁক দেন। গাইবার পদ্ধতিতেও তাঁরা গানের স্বরসুষমাগত সামূহিক রূপান্তর অপেক্ষা—একাংশের বিচিত্র পুনরাবৃত্তির অধিক পক্ষপাতী। তাঁরা স্বর বিহারের যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করেন যাতে উপযুক্ত সঙ্গতের সাহায্য ব্যতীত সব সময় ছন্দ ও তাল ঠিক বোধগম্য হয় না। অনেকটা নিপুণ খেলোয়াড়ের মনোভাব নিয়ে এরা সমগ্রভাবে শ্রোতাদের চিত্ত আকৃষ্ট করতে প্রয়াস পান। সেই জন্য স্বল্প প্রতিভাবিশিষ্ট গায়কগণের গান সময় সময় ভাবসৃষ্টির দিক থেকে দরিদ্র হয়ে পড়ে।…হিন্দু গায়কগণের ও এই সমস্ত ক্ষমতা আছে বটে, তবে তাঁদের প্রকাশভঙ্গী এত জীবন্ত ও হর্ষোচ্ছল নয়। ভৈরবী, বসন্ত, টোড়ি প্রভৃতি শান্ত সমাহিত রাগেই তাঁদের চূড়ান্ত নৈপুণ্য দেখা যায়। তালের ক্ষেত্রেও সুরফাঁক্তা, আড়া চৌতাল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভারী ও অসমতালেই তাদের কৃতিত্ব বেশী। তাঁদের গান শুনে খুবই মনে হয় যে তার উৎস তাঁদের হৃদয়—এবং শ্রোতৃবৃন্দের বাহবা অপেক্ষা সহানুভূতি আকর্ষণ করার দিকেই যেন তাঁদের চেষ্টা বেশী।) এই মতবাদ সম্পর্কে বলা চলে যে এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। লেখক প্রথমেই বলেছেন যে ব্যাপারটি "more easily felt than described". তিনি যদি ভারতীয় সঙ্গীত আরও বেশী করে শুনবার সুযোগ পেতেন—তাহ'লে হয়তো তাঁর এই মত বদলাতো। (তিনি নিজেই বলেছেন ভারতে আর কিছুদিন থাকলে তাঁর ধারণা কিছুটা হয়তো পরিবর্ত্তিত হ'ত খুঁটিনাটির ব্যাপারে।) মুসলমান গায়কদের কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃত হাল্কা, লঘু, আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ রাগরাগিণী গাওয়াতে এবং হিন্দু সুরজ্ঞদের কৃতিত্ব গভীর ও বিষাদপূর্ণ সুরে—একথা ভারতীয় সঙ্গীতের দরদী শ্রোতা মানতে চাইবেন না। খাম্বাজ, কাফি, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ এবং ত্রিতাল, দাদরা প্রভৃতি তালে মুসলমান গায়কদের বিশেষত্ব এবং ভৈরবী, বসন্ত, টোড়ি ইত্যাদি রাগ এবং চৌতাল, সুরফাঁক্তা প্রভৃতি তালে হিন্দু

গায়কদের বিশেষত্ব একথা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যাঁর ভারতীয় সঙ্গীত শ্রবণের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে এই ভাবে ভাগ করতে যাওয়া বাতুলতা। উত্তর ভারতের নাম করা মুসলমান গুণীদের গানবাজনা যিনি মন দিয়ে শুনেছেন—আবদুল করিম খাঁ সাহেবের মুখে ভৈরবী বা বসন্ত এবং ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মুখে রামকেলী বা টোড়ী—যাঁর কর্ণগোচর হয়েছে, তিনিই উপরিউক্ত মতবাদের অসারতা বুঝতে পারবেন। আর সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে গুণীরা যখন শিষ্য গ্রহণ করেন না—তখন কোনও বিশেষ গায়কী চাল—কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেও পারে না। ভারতবর্ষ কোনও শিল্পকলার ক্ষেত্রেই ধর্ম্মসম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়নি, সঙ্গীত জগতে তো কোনও দিনই না! সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার রায়ের একটি উক্তি মনে পড়ে যায় এই প্রসঙ্গে,- আবদুল করিম খাঁ যখন গান ধরতেন—তখন তিনি হিন্দু না মুসলমান না আফ্রিকার নিগ্রো এসব কোনও প্রশ্ন মনে উঠতো না। ভারতীয় স্বর সাধকের এই হচ্ছে যথার্থ রূপ, তা কোনও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়।

এতক্ষণকার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা করা হ'য়েছে যে ভারতের মাটিতে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সংস্কৃতির পাশাপাশি জীবন-যাত্রায়—এদের মধ্যে বিরোধের চেয়ে বোঝাপড়াই হয়েছে বেশী। স্বীয় স্বীয় প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও এদের পরস্পরকে গ্রহণ করতে বাধেনি। অপরিচয়, অল্প-পরিচয় ও বিরোধের অধ্যায় কেটে গিয়ে মিলন ও সমন্বয়ের অধ্যায় সুরু হ'তে বিলম্ব হয়নি। উপসংহারে বাংলা সাহিত্য থেকে এর তিনটি নিদর্শন তুলে দিচ্ছি। আমাদের সাহিত্যে এই সংঘাত ও সমন্বয়ের অধ্যায়গুলির সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। প্রথমটি কবি বিদ্যাপতির রচনা থেকে—মুসলমান তখন এদেশে নবাগত—তাই

পরস্পরের সম্পর্কে বিরোধ ও অবিশ্বাসের ভাবটাই বেশী। তাঁর "কীর্ত্তিলতা" নামক কাব্যগ্রন্থে (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) বিদ্যাপতি বলেছেন—

"হীন্দু তুরকে মিলল বাস।
একক ধর্ম্মে অওকো উপহাস॥
কতহুঁ বাংগ কতহুঁ বেদ!
কতহুঁ মিসিমিল কতহুঁ ছেদ॥
কতহুঁ ওঝা, কতহুঁ খোজা।
কতহুঁ নকত, কতহুঁ রোজা॥
কতহুঁ তম্বারু, কতহুঁ কূজা।
কতহুঁ নীমাজ, কতহুঁ পূজা॥
কতহুঁ তুরক, বরকর।
বাট জাঁইতে বেগার ধর॥
ধরি আনএঁ বাঁভন বড়ুয়া।
মথা চড়াবএ গাইক চুড়ুয়া॥
ফোট চাট জনউ তোড়।
উপরে চড়াবএ চাহ ঘোড়॥
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ।
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ॥
গোরি গোমঠ পুরলি মহী।
পএরহু দেমা এক ঠাম নহী॥
হীন্দু বোলি দূরহি নিকার।
ছোটেও তুরুকা ভভকী মার॥
হীন্দুহি গোট্টও গিলিএ ফল তুরক দেখি হোঅ ভান।
অইসেও তসু পরতাপে রহ চিরজীবত সুরতান॥"[১]

১। কীর্ত্তিলতা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত—কলিকাতা, ১৩৩১) পৃঃ ১৭-১৮

এই অংশের অনুবাদ—"হিন্দু তুরুকের বাস কাছাকাছি। কিন্তু একের ধর্ম্মে অপরের উপহাস। একের আজান অপরের বেদ। কারো সমাজে মেলামেশা কারো সমাজে ভেদ। একের পণ্ডিত ওঝা অপরের পণ্ডিত খোজা। একের নকত, অপরের রোজা। একের তাম্রকুণ্ড, অপরের কুঁজা। একের নমাজ, অপরের পূজা। কতক তুরুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গরুর রাঙ্। ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে। ধোয়া উড়িধানে মদ চোলাই করে দেউল ভেঙ্গে মসজিদ বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হ'ল পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে দূরে নিকালো। তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়। হিন্দুর গোষ্ঠ গ্রাস করে তাতে যে ফল উৎপন্ন হ'চ্ছে তা দেখে তুরুকেরা মহা আনন্দ করছে। ঐরূপে তাদের প্রতাপে সুলতান চিরজীবী হোন।"[১]

পরবর্ত্তী উদাহরণ দিচ্ছি কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত (সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে রচিত) সুবিখ্যাত গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃত থেকে। এর থেকে দেখা যায় ধর্ম্মব্যাপারে মতবিরোধিতা প্রবল হ'লেও এই সময়ে গ্রামে গ্রামে হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রীতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হ'য়েছিল। মুসলমান কাজী সাহেব কীর্ত্তনে বাধা দেওয়ায়, চৈতন্যদেব যখন সদলবলে তাঁর বাড়ী গিয়ে কৈফিয়ৎ চান, তখন কাজী সাহেব ব্যস্ত হ'য়ে এই পারিবারিক বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টিত হ'ন—

"গ্রাম সম্পর্কে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা
দেহ সম্বন্ধ হইতে হ'য় গ্রাম সম্পর্ক সাঁচা।

১। শেষ দুই পঙ্‌ক্তি বাদে, বাকী অংশটির অনুবাদ অধ্যাপক সুকুমার সেন কৃত (মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী পৃঃ ৭;) অবশিষ্টটুকুর অনুবাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্করণে প্রদত্ত তাঁর অনুবাদ অপেক্ষা. সুকুমার বাবুর অনুবাদ অনেক প্রাঞ্জল ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হ'য় তোমার নানা
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।"[১]

পরস্পরের সুখদুঃখের সাথী একই গ্রামবাসী হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবনের খানিকটা আভাস উদ্ধৃত কাব্যাংশে আমরা পাচ্ছি। "কীর্ত্তিলতার" চিত্রটির সঙ্গে এই বর্ণনার পার্থক্য সুস্পষ্ট! পরবর্ত্তী উদাহরণটি দিচ্ছি একটি গ্রাম্য সঙ্গীত থেকে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার প্রতাপশালী এবং স্বনামখ্যাত শাসক সীতারাম রায়ের রাজত্বের বর্ণনা পাওয়া যায় এই গানটিতে। সীতারাম রায়ের উদার শাসননীতির ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে অকৃত্রিম প্রীতি ও সখ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হ'য়েছিল তার একটি চমৎকার চিত্র এতে আঁকা হ'য়েছে—

"রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই
কাজে লড়াই কাটাকাটি নাহিক বালাই।
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন, মুসলমানে খায়
মুসলমানের রস পাটালী হিন্দুর বাড়ী যায়।
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুই জন
ভজন পুজন যেমন ইচ্ছা করুকগে তেমন।
মিলে মিশে থাকা সুখ তাতে বাড়ে বল,
ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীরা খল।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিতে হিন্দু-মুসলমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যে আবছা আভাস পাওয়া যায়—বর্ত্তমান ছড়াটিতে তারই একটি বিস্তৃততর, পূর্ণতর

২। চৈতন্য চরিতামৃত—আদি লীলা ১৭।১৪৯-৫১

ও মধুরতর ছবি দেখা যাচ্ছে। দুটি সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ক্রমশঃ কোন ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল—উপরের তিনটি উদাহরণ পর পর এবং রচনাকালের দিকে দৃষ্টি রেখে পড়লে সহজেই বোঝা যায়। এই ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্যের ফল সম্পর্কেও শেষ ছড়াটি আমাদের কতকটা আভাষ দিচ্ছে—"ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীরা খল।" আজকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর কাজে যারা অগ্রণী তারা ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করবেন কবে ?

পাঁচ

উপসংহার

তাহ'লে সমস্ত ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ালো? শেষ করবার পূর্ব্বে একবার সেটা হিসাব করে নেওয়া ভাল। বিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক জগতে "বিশুদ্ধ" গোষ্ঠী বলে কিছু নেই। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে যে—ঐতিহাসিক প্রগতি বরাবর বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়েই ঘটেছে। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত 'জগতের সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতাগুলি—তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক বহিঃপ্রভাবকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছে। এক কথায় ইতিহাসে কোনও উল্লেখযোগ্য "অবিমিশ্র" বা "বিশুদ্ধ" সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া যায় না। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মের এই পটভূমি-কায় ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ আমাদের আলোচ্য। নৃতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত কতগুলি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই স্তরগুলির পরস্পর সংমিশ্রণে বর্ত্তমান ভারতীয় মহাজাতি গড়ে উঠেছে। ভারতীয় জনসাধারণের এই বৈজ্ঞানিক স্তর-বিভাগের সঙ্গে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক বিভাগের কোনও সামঞ্জস্য নেই। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায় বিভিন্ন সংস্কৃতির বাহক-হিসাবে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন যুগে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাসকল ও সংস্কৃতির মধ্যে এই বিভিন্ন উপাদান বর্ত্তমান। সুতরাং একথা মানতে হ'বে যে ভারতে কোনও "বিশুদ্ধ" জাতি বা "বিশুদ্ধ" সংস্কৃতির অস্তিত্ব নেই। হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় তার কোনও বিশুদ্ধ জাতির মধ্যে উদ্ভব হয়নি। নানা বিচিত্র উপাদানে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠিত

এবং নানা বহিঃপ্রভাব নানা সময়ে একে পুষ্ট করেছে। ইসলামের উৎপত্তি থেকে তার ভারতে আগমন পর্য্যন্ত, ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখানো হ'য়েছে যে বিশুদ্ধ রক্ত কোনও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির মধ্যে ইসলামের উৎপত্তি হয়নি এবং অসংখ্য বহিঃপ্রভাব নানা সময়ে ইসলামীয় সংস্কৃতির উপর পড়েছে। সুতরাং পরস্পর সম্মুখীন হ'বার সময় হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সভ্যতা রক্ত ও সংস্কৃতি কোনও দিক দিয়েই "বিশুদ্ধ" ছিল না। ভারতের ইসলামের আগমন কোনও নূতন জাতির আগমন নয়—একটি নূতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আগমন। মুসলমান শাসন ভারতের মাটিতে কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। ভারতে মুসলমান অভিযান ও শাসন প্রণালীর যে চিত্র আমরা এযাবৎ প্রধানতঃ পাশ্চাত্য লেখকদের মারফৎ পেয়েছি, তা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতার রঙে রাঙানো। কিন্তু নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়—ভারতের মুসলমান শাসনের ইতিহাস কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক বিরোধের ইতিহাস নয়। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কোনও শাসকের সাম্প্রদায়িক মনোভাব তার শাসন-নীতিকে প্রভাবিত করেছে; কিন্তু মোটামুটি সাম্রাজ্যশাসননীতির ভিত্তি সর্ব্বদা সাম্প্রদায়িক ছিল না,—সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য মুসলমান শাসকেরা হিন্দু রাজাদের সঙ্গে মিতালী করতে কুণ্ঠিত হ'ননি। মুসলমান শাসকদের নিজেদের মধ্যে প্রবল বিরোধের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় প্রচুর। মুসলমান যুগের ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিও সর্ব্বাংশে সাম্প্রদায়িক ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমশঃ ভারতীয় সমাজদেহের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে এবং সামন্ততন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের উপর সমানভাবে চেপে বসে। পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে বাস করবার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ আদান প্রদান বাড়তে থাকে এবং ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে

এর ফলে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আমরা পাই সুফীদর্শন, মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন, দীন ইলাহি, মাজমা-উল-বাহরেইন। এই সংস্পর্শ,—যা হিন্দু ও মুসলমান মানসে এত গভীর পরিবর্ত্তন আনে,—মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রেই তার ছাপ রেখে যায়। সাহিত্য, স্থাপত্যবিদ্যা, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সংস্কৃতির কয়েকটি ক্ষেত্রের পরপর আলোচনা করে দেখানো হয়েছে—হিন্দু ও মুসলিম প্রভাব এই সকল ক্ষেত্রে কি গভীরভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

তাই এ'কথা আজ মানতেই হ'বে যে, ভারতে স্বতন্ত্র হিন্দু জাতি বলে কোনও জাতি নেই, স্বতন্ত্র মুসলিম জাতি বলে কোনও বিশুদ্ধ জাতি নেই। আজকের ভারতবর্ষে আছে বহু বিচিত্র উপাদানে গঠিত এক ভারতীয় মহাজাতি—আর বহু বিভিন্ন প্রভাব-পুষ্ট, বৈচিত্র্যময় এক অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতি। এ কথা বলার অর্থ—এই ভারতীয় সংস্কৃতি যে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত সেগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা নয়; এই বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে এরই ভিত্তির উপর ভারতীয় সংস্কৃতির অখণ্ডত্ব প্রতিষ্ঠিত। আজকের জগতের কাছে একজন হিন্দুর পরিচয় একজন ভারতীয় বলে,—ধর্ম্মে সে হিন্দু। তেমনি ভারতীয় মুসলমানের ও পরিচয় একজন ভারতীয় বলে—ধর্ম্মে সে মুসলমান। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় দুটি স্বতন্ত্র জাতি এবং তাদের সেই ধর্ম্মগত পার্থক্যটাকে দুটি এলাকায় ভাগ করে চিরকালের মত স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন—এই মতটা ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের চোখে নিতান্ত হাস্যকর। শেষোক্ত দুটি শাস্ত্রের সাক্ষ্য চিরকাল তার বিরুদ্ধে।

আজকে ভারতবর্ষের রাজনীতিজগতে এই সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবাদ নানা কারণে খুব মুখর হয়ে উঠেছে। এটা যতক্ষণ রাজনৈতিক চালমাত্র থাকে—ততক্ষণ সাময়িক রাজনৈতিক যুক্তির সাহায্যে এর সমর্থকদের

নিরস্ত্র করা চলতে পারে এবং তাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্বাতন্ত্র্যবাদ ইদানীং আর রাজনৈতিক চালমাত্র নেই—এর একটি বিজ্ঞান দর্শন-সম্মত ভিত্তি খাড়া করবার চেষ্টাও সুরু হয়ে গিয়েছে—এবং তার নব নামকরণ হয়েছে "দুই-জাতি-বাদ"। বলা হচ্ছে যে ভারতীয় মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি ; সুতরাং এর জন্য একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এলাকা বা রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এর স্বপক্ষে সমর্থকেরা যদিও গলার জোর ভিন্ন অন্য কোনও যুক্তিই দেখাতে পারেননি তবু আশঙ্কা হয় এই ভেবে যে গলার জোরে দিনকে রাত করবার নিদর্শন আধুনিক সময়ে একেবারে বিরল নয়, এবং তা দিয়ে জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখাও চলে বেশ কিছুদিন, বিশেষতঃ যদি গলার জোরে প্রচারিত মতবাদটি আপাতঃদৃষ্টিতে মনোমুগ্ধকর দেখায়। উদাহরণস্বরূপ—হিটলার ও নাৎসীপার্টি প্রচারিত "বিশুদ্ধ আর্য্যবাদের" উল্লেখ করা চলে। কিন্তু বক্তব্য এই যে, যে মুহূর্ত্তে কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেন—ভারতীয় মুসলমান একটি স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ জাতি, তখনই প্রশ্নটি আর রাজনৈতিক প্রশ্নমাত্র থাকে না ; সেটি বৃহত্তর আকার ধারণ করে ইতিহাস ও নেতৃত্বের সীমানার ভিতর এসে পড়ে। সুতরাং সেখানে এর সমাধানের ভার দিতে হবে প্রধানতঃ ঐ সব শাস্ত্রকেই।

———

গ্রন্থ-পঞ্জী

Vincent A. Smith . . . The Oxford History of India.

Marret . . . . Anthropology.

Gordon-Childe . . . . What Happened in History.

B. S. Guha . . . . . The Racial Element in the Population.

P. C. Bagchi . . . . . Pre-Aryan & Pre-Dravidian in India.

Kittel . . . . Kanarese Dictionary.

Marshall . . . . . . Mohenjodaro and the Indus Civilization—in 3 volumes

Huxley, Haddon and Carr-Saunders . . . . . We Europeans.

Bhupendra Nath Datta . Studies in Indian Social Polity.

Percy Brown . . . . . Indian Architecture Vol. I (Hindu & Buddhist Period); Vol. II (Islamic Period).

Indian Census Report 1931 Vol. I.

McCrindle . . . . Invasion of India by Alexander the Great.

Tarn . . . . The Greeks in Bactria and India.

Radhakrishnan . . . . Eastern Religions and Western Thought.

The Hindu View of Life.

Foucher . . . . . The Beginnings of Buddhist Art.

Smith . . . . The Early History of India (4th Edition).

Aśoka (3rd Edition).

A New History of the Indian People Vol. VI (The Vākātaka-Gupta Age) (Bhāratīya Itihās Parishad)

R. K. Mookherji . . . . Harsha.

Haddon . . . . The Races of Man.

Khuda Buksh . . . . Contributions to the History of Islamic Civilization (including a translation of Von Kremer's Kulturgeschichtliche streifzuge Auf Dem Gebiete Des Islams).

Bartold . . . . Mussulman Culture.
O'leary . . . . Arabic Thought and its Place in History.
Arnold and Guillaume (edited by) . . . . . The Legacy of Islam.
Muhammad Iqbal . . . The Reconstruction of Religous Thought in Islam.
Hunter . . . . The Indian Musalmans.
Eliot & Dowson . . . . History of India as told by its own Historians—in 8 volumes.
Arnold . . . . The Preaching of Islam.
Asoke Mehta and Achyut Pattawardhan . . . . The Communal Triangle in India.
Sewell . . . . A Forgotten Empire.
S. Krishnaswami Aiyangar . South India and her Mohummadan Invaders.
Habib . . . . Sultan Mahmud of Ghazni.
Tarachand . . . . Influence of Islam on Indian Culture.
Surendra Nath Sen . . . The Military system of the Marathas.
Proceedings of the Indian History Congress (Third Session Calcutta, 1939)
K. R. Quanungo . . . Sher Shah.
Memoirs of Babar (translated by Leyden & Erskin)—Revised by King.
Smith . . . . Akbar—the Great Mogul.
Irvine . . . . Later Mughals—2 Volumes.
Moreland . . . . . . India—at the death of Akbar.
From Akbar to Aurangzeb.
Jadunath Sarkar . . . History of Aurangzeb in 5 Volumes.
Nicholson . . . . The Mystics of Islam.
Titus . . . . Indian Islam.
M. L. Roy Chowdhury . . Din-i-Ilahi or The Religion of Akbar.
Majma-ul-Bahrain (Persian Text with English Translation,—edited and translated by M. M. Haq—Bibliothica Indiaca).
J. E. Carpenter . . . . Theism in Medieval India.
T. Rajagopala Chariar . . The Vaishnavite Reformers of India.
Poems of Kabir (translated by Rabindra Nath Tagore)
Jadunath Sarkar . . . . Shivaji and His Times.
Ranade . . . . Rise of the Maratha Power.

Indubhushan Bannerji . .	The Evolution of the Khalsa Vol. I.
N. N. Law	Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule.
	Cambridge History of India Vol iii
G. T. Garrat (edited by) .	The Legacy of India.
E. B. Havell	Indian Architecture.
C. J. Brown	Indian Coins.
Hodivala	Historical Studies in Mughal Numismatics.
Percy Brown	Indian Painting.
L. Binyon	The Court Painters of the Grand Moguls.
Coomarswami	Rajput Painting.
Jadunath Sarkar	Studies in Mughal India.
Abul Fazl	Ain-i-Akbari (translated by Blochman).
Ameer Ali	The Spirit of Islam.
A. H. Fox-Strangways . .	The Music of Hindostan.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য
	ভারতের ভাষা ও সমস্যা

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

বরাহ-মিহির বৃহৎ সংহিতা (Text edited by Kern)

কোর্-আন্ শরীফ (গিরিশচন্দ্র সেনের বঙ্গানুবাদ—মৌলানা আক্রাম খাঁ লিখিত ভূমিকা সহ।)

বিজয়চন্দ্র মজুমদার	প্রাচীন সভ্যতা
মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ	মোস্তাফা-চরিত (দ্বিতীয় সংস্করণ)
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঙ্গলার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড
রমা চৌধুরী	বেদান্ত ও সুফী দর্শন
এনামুল হক্	বঙ্গে সুফী প্রভাব
ক্ষিতিমোহন সেন	ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা
	কবীর (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)
	দাদূ
	বাংলার সাধনা

সুকুমার সেন	মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ	মনসা-মঙ্গল (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত)
অমিয়নাথ সান্যাল	প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত-চিন্তা
বিদ্যাপতি	কীর্ত্তিলতা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্য-চরিতামৃত
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস ('পরিচয়' পত্রে প্রকাশিত ধারা-বাহিক প্রবন্ধ। এর প্রথমাংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে।)